নবাগত এবং স্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁদের কোন যোগাযোগ ও বোঝাপড়া ছিল না। ফলে নেতাদের মধ্যে আস্থার অভাব দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, রুজভেল্টের দূরপ্রাচ্য সম্পর্কীয় ইয়াল্টা শর্তগুলি মার্কিন কংগ্রেস, মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলী বা পেন্টাগনের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এজন্য আমেরিকায় এই সমালোচনা করা হয় যে—"রুজভেল্ট ইয়াল্টায় স্টালিনের নিকট আত্মসমর্পন করেন"। (Yalta surender)। রবার্ট শেরউড মন্তব্য করেছেন যে "জার্মানি ও জাপানের পূর্ণ পরাজয়ের পর বিশ্বে যে সকল সমস্যা দেখা দেয় তার অনেকগুলিই ইয়াল্টা চুক্তি থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়।"

প্রকৃতপক্ষে, ইয়াল্টা চুক্তি সম্পর্কে এই সকল অভিযোগের কোন ভিত্তি নাই। পূর্ব-পশ্চিম ঠাণ্ডা লড়াই আরম্ভ হলে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সেই পটভূমিকায় ইয়াল্টা চুক্তিকে বিচার করে 'আত্মসমর্পণ' আখ্যা দেওয়া হয়। ট্রুম্যান ও তাঁর পরামর্শদাতারা ভুলে যান যে, পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিই ছিল ইয়াল্টা চুক্তির মূলে। রুজভেল্ট সোভিয়েত রাশিয়াকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন কেন, তার উত্তরে বলা হয় রুজভেল্ট দূরপ্রাচ্যে যুদ্ধের ব্যাপারে মিত্রপক্ষের সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন না বলে রাশিয়াকে যুদ্ধে টেনে আনতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়ার হস্তক্ষেপই দূরপ্রাচ্যে যুদ্ধকে সংক্ষিপ্ত করতে পারবে। সমালোচকদের মতে, পারমাণবিক বিস্ফোরণে সাফল্যের পর আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ঐতিহাসিক ফ্লেমিং যথার্থই যুক্তি দেখিয়েছেন, ইয়াল্টা সম্মেলনের সময়ে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। তাই কেবল রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়, মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, দূরপ্রাচ্যের যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য অবশ্যই প্রয়োজন। রুজভেল্ট চেয়েছিলেন রাশিয়ার সাহায্যে যুদ্ধকে সংক্ষিপ্ত করে অযথা রক্তক্ষয়ের অবসান ঘটানো এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। মোট কথা, জাপানের সেনাবলের বিরুদ্ধে রুশ সাহায্য পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের আগে দরকারী মনে হয়। সেজন্য দূর প্রাচ্যে কিছু সুযোগ-সুবিধা রাশিয়াকে দিতে হয়। ইয়াল্টার প্রস্তাবের সাফল্য রাশিয়ার সহযোগিতার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং রাশিয়াকে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবেই গণ্য করা যেতে পারে। অপরদিকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ইয়াল্টা চুক্তিতে কতকগুলি সমস্যার সমাধান না করে ধামাচাপা দেওয়া হয় এবং কতকগুলি সমস্যার এমন সমাধান হয় যে, পরে সে বিষয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। ইয়াল্টা চুক্তিকে রুজভেল্টের রুশ তোষন বলা না গেলেও, পোল্যাণ্ডের প্রায় ৪৭% রাশিয়াকে ছেড়ে দেওয়ার পরেও পোল্যাণ্ডে রুশ প্রভাবিত লুবলিন সরকার গঠন এবং ১৯৪৭ খ্রিঃ ইয়াল্টা চুক্তির পরে নামেমাত্র নির্বাচন করে লুবলিন সরকারের তথাকথিত বৈধতা প্রতিষ্ঠা, ইয়াল্টা চুক্তির প্রতি রুশ ন্যায় বিচারের

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইয়াল্টা সম্মেলনেই ঠাণ্ডা লড়াই-এর মুখবন্ধ রচিত হয়

মাসে ইয়াল্টা চুক্তির সময়কাল থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত মার্শাল স্টালিন এমন কতকগুলি কাজ করেন যে, তার ফলে পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্কে ফাটল ধরে। প্রথমত, পোল্যান্ডে লুবলিন (Lublin) সরকারকে লাল ফৌজের ছাতার নীচে শুধু আশ্রয় দেওয়া হয় নি, পোল্যান্ডে অ-কমিউনিস্ট নেতাদের বন্দী বা অন্তরীন করা হয়। স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার বর্জিত হয়। দ্বিতীয়ত, হাঙ্গেরীর কাছ থেকে সোভিয়েত রাশিয়া এক বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দাবী করে এবং ১৯৪৪ খ্রিঃ মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট ইমরেনাগির মাধ্যমে ভূমি-সংস্কার করা হয়, যাতে কমিউনিস্টদের জনপ্রিয়তা বাড়ে। তৃতীয়ত, রুমানিয়ায় ১৯৪৪ খ্রিঃ কমিউনিস্ট পার্টির মাত্র ৪০০ সদস্য ছিল। ১৯৪৪-এর মার্চ মাসে রুশ মন্ত্রী ভিসি নিস্কির হস্তক্ষেপে রুমানিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন স্থাপিত হয়। চতুর্থত, বুলগেরিয়ায় লাল ফৌজ ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করে এবং অ-কমিউনিস্টদের দমন করে। পঞ্চমত, চেকোশ্লোভাকিয়ায় কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলেও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি কমিউনিস্টরা অধিকার করে নেয়। ষষ্ঠত, যুগোশ্লাভিয়াতে স্থানীয় কমিউনিস্ট দল মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে জার্মানদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করে। স্টালিন যুগোশ্লাভ কমিউনিস্টদের নিজ পছন্দমত কমিউনিস্ট শাসন গঠনের অধিকার দেন। সপ্তমত, আলবানিয়ায় কমিউনিস্ট গেরিলাগণ সরকার দখল করে নেয়। অষ্টমত, এছাড়া পূর্ব জার্মানি ও পূর্ব অস্ট্রিয়া লাল ফৌজ দখল করায় এই স্থানগুলিতেও লাল ফৌজের ছত্রছায়ায় কমিউনিস্ট শাসন গড়ে ওঠে। মোট কথা, ইয়াল্টা চুক্তির কয়েক মাসের মধ্যেই পূর্ব জার্মানি সহ গোটা পূর্ব ইওরোপে রুশ তাঁবেদার কমিউনিস্ট শাসন স্থাপিত হয়। এই সকল স্থানে রুশ লাল ফৌজ দখলদারী থাকায় কমিউনিস্ট দলগুলি তার সুযোগ নিয়ে অ-কমিউনিস্টদের উৎখাত করে দেয়। ইয়াল্টা চুক্তিতে আটলান্টিক চার্টারের ভাবধারা অনুযায়ী এই সকল স্থানে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের কোন ব্যবস্থা হয় নি। এর ফলে যারা ইয়াল্টা চুক্তির ফলে আনন্দে আত্মহারা হয়, তারা এখন মুষড়ে পড়ে। রুজভেল্ট ইয়াল্টা চুক্তির পরিণাম দেখে অনুতপ্ত হন এবং জার্মানিতে ইঙ্গ–মার্কিন শান্তি চুক্তির শর্ত নমনীয় করতে সঙ্কল্প নেন। এজন্য স্টালিন রুজভেল্টকে ভর্ৎসনা করেন। রুজভেল্ট তদুত্তরে স্টালিনকে আমেরিকার জার্মান নীতিকে 'নক্কারজনক ভ্রান্ত ব্যাখ্যা' (Vile misrepresentations) বলে মৃদু তিরস্কার করেন। এদিকে ইয়াল্টা চুক্তি অনুযায়ী জাপান আক্রমণের জন্য রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় সেনা সমাবেশ করে। কিন্তু মার্কিন সমর বিভাগ জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরে এ্যাটম বোমা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিলে, রাশিয়াকে আর জাপানের ভূখণ্ডে নামার সুযোগ দেওয়া হয় নি। এজন্য রুশ নেতারা বিরক্তি বোধ করেন। এইভাবে ইয়াল্টা চুক্তির অব্যবহিত পরেই পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে মন কষাকষি শুরু হয়। আপাততঃ প্রধান সমস্যাগুলি, যথা—জার্মানি ও তার মিত্রদেশের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন, ইওরোপের পুনর্গঠন প্রভৃতি সমস্যার সমাধানের জন্য পটসডামের সম্মেলনে ১৭ জুলাই, ১৯৪৫ খ্রিঃ নেতারা পুনর্বার মিলিত হন। বার্লিনের কাছে পটসডাম শহরে আয়োজিত সম্মেলন ১৭ জুলাই থেকে ২ আগষ্ট, ১৯৪৫ পর্যন্ত চলেছিল।

নিদর্শণ নয় বলে বহু ঐতিহাসিক মনে করেন। আসলে পোল্যাণ্ড সংক্রান্ত ব্যাপারে ইয়াল্টা সম্মেলনে যে চুক্তি উভয় পক্ষ করেন তার মধ্যেই ভবিষ্যৎ সমস্যার বীজ নিহিত ছিল। পোল্যাণ্ড সংক্রান্ত চুক্তি ছিল একাধারে বিভ্রান্তিকর ও ত্রুটিপূর্ণ। উইলিয়ামস ও পি ও ব্রোয়স্কি মনে করেন যে, সংশ্লিষ্ট চুক্তির অস্বচ্ছতাকে উভয় পক্ষই তাদের মতো করে ব্যবহার করেছিল। Wayne C. Mc Williams & Harry Piotrowski লিখেছেন— "The ambiguity of the agreement allowed both sides to interprel it as they saw fit."[১] দ্বিতীয়ত, পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্ত জার্মানির ওডার-নাইসা নদী পর্যন্ত বিস্তারের দাবী পশ্চিমী দেশগুলি ইয়াল্টাতে ধামাচাপা দেয়। পরে এ নিয়ে বহু গণ্ডগোল হয়। লাল ফৌজ যেহেতু এই অঞ্চলে দখলদার ছিল, সেহেতু কাগজে-কলমে না হলেও হাতে-কলমে এই অঞ্চল তারা দখলে রাখে। তৃতীয়ত, জার্মানির ক্ষতিপূরণের বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে পশ্চিমী দেশের সঙ্গে রাশিয়ার তীব্র মতাবিরোধ হয়। চতুর্থত, ইয়াল্টা চুক্তির কালি শুকাবার আগেই রুশ বিদেশমন্ত্রী ভিসি নিস্কির হস্তক্ষেপে রুমানিয়ার রাজা মাইকেল তাঁর কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করে রাশিয়ার মনোনীত কমিউনিস্ট মন্ত্রীসভা গঠনে বাধ্য হন। সুতরাং ইয়াল্টা চুক্তির মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর বীজ নিহীত ছিল। ইয়াল্টা সম্মেলনে যে সমস্যাগুলি উত্থাপন করা হয়েছিল যেমন—পোল্যাণ্ড এবং যুদ্ধোত্তর কালের পোল্যাণ্ডের সীমান্ত, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, জাপানের বিরুদ্ধে লাল ফৌজের অংশ গ্রহণ, জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার প্রশ্ন ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলি পূর্ব ও পশ্চিম-শক্তিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক কেনেথ টমসন মনে করেন যে ইয়াল্টা সম্মেলনেই ঠাণ্ডা লড়াই-এর মুখবন্ধ রচনা হয়েছিল (...."Yalta became a watershed between the era of war-time cooperation and the first stories of the Cold War")।[২]

পটসডাম সম্মেলন জুলাই, ১৯৪৫ (The Potsdam Conference) : ইওরোপে যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার দু মাসের মধ্যে ১৯৪৫-এর জুলাই মাসে বিজয়ী পক্ষ পটসডামে মিলিত হয়। রুজভেল্টের মৃত্যুর পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান রুমানিয়া ও পোল্যাণ্ডে সোভিয়েত নীতি লক্ষ্য করে এই ধারণা করেন যে, সোভিয়েত রাশিয়া ইয়াল্টা চুক্তির শর্ত রক্ষা করছে না। ইয়াল্টা চুক্তি সম্পাদনের পর স্বদেশে ফিরে এসে রুজভেল্ট নিজেই আক্ষেপ করেন যে, রাশিয়া ইয়াল্টার সদিচ্ছার দাম দিচ্ছে না। ইতিমধ্যে রুজভেল্ট দেহত্যাগ করেন। মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যান রাষ্ট্রপতির পদে বসেন। তিনি ছিলেন কট্টর সোভিয়েত-বিরোধী। ১৯৪৫ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারি

পটসডাম সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমী শক্তি-গুলির নানা বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়

---

১. The World since 1945–Wayne C. Mc Williams & Harry Piotrowski, P. 33
২. Principles and Problems of International Policies–Keneth W. Thomson, 1950

সরকার উৎখাত হয়ে লণ্ডনে আশ্রয় নেয় ও নির্বাসিত পোলিশ সরকার গঠন করে, তাকে এই নির্বাচনে যোগদানের অধিকার দিতে হবে। শেষের দুটি শর্ত সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইয়াল্টায় হয় নি বলে অধিকাংশ পশ্চিমী লেখক দাবী করেন। অপর দিকে সোভিয়েত লেখকেরা বলেন যে, স্টালিনের শর্ত গৃহীত হয়। অপর দিকে ১৯৪১ খ্রিঃ জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করলে পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্টদের সাহায্যে মস্কোতে একটি নির্বাসিত পোলিশ কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয়েছিল। লাল ফৌজ জার্মানি দখল করার সঙ্গে সঙ্গে এই নির্বাসিত কমিউনিস্ট সরকারকে রাশিয়া পোল্যাণ্ডে ক্ষমতায় স্থাপন করে। শেষ পর্যন্ত মার্কিন ও ব্রিটেনের প্রস্তাব ছিল যে, যদি এই কমিউনিস্ট সরকারের ভিতর লণ্ডনে নির্বাসিত সরকারের কিছু সদস্য নিতে রাজী হয়, তাহলেও চলবে। স্টালিন তাতে রাজি না হওয়ায় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের শর্ত দেওয়া হয়।

ইয়াল্টা ঘোষণাপত্রে ইওরোপীয় দেশগুলির পুনর্গঠনের মূলনীতি

তিন প্রধান ইয়াল্টার ঘোষণাপত্র দ্বারা (Yelta Communique) যে সকল দেশকে জার্মান অধিকার থেকে মুক্ত করা হবে সেই দেশগুলির পুনর্গঠনে মূলনীতি ব্যাখ্যা করেন। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয়, (১) ইওরোপে যে সকল পরিবর্তন সাধন হবে তা 'আটলান্টিক সনদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে' করা হবে। বলা বাহুল্য, আটলান্টিক সনদে বলা হয়েছিল যে, প্রতি জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অক্ষুন্ন রাখা হবে। (২) এই ঘোষণাপত্রে আরও বলা হয় যে, অক্ষশক্তির মিত্র-স্থানীয় দেশগুলির জনসাধারণকে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে যে, তাদের 'রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী গণতান্ত্রিক উপায়ে' সমাধান করা হবে। (৩) এই উদ্দেশ্যে তিন প্রধান আশ্বাস দেন যে, আত্মসমর্পণ করার পর এই দেশগুলিতে 'অন্তবর্তী সরকার গঠন' করা হবে। স্বাধীন ও অবাধ গণতান্ত্রিক নির্বাচন দ্বারা এই দেশগুলির স্থায়ী সরকার গঠিত হলে তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে এবং তাদের সঙ্গেই শান্তি চুক্তি স্থাপিত হবে।

দূরপ্রাচ্যে জাপান সম্পর্কে ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার চুক্তি

'দূরপ্রাচ্য সম্পর্কেও' ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার ইয়াল্টায় চুক্তি হয়। যেহেতু তখনও জাপান পূর্ণ উদ্যোগে যুদ্ধ চালাচ্ছিল এবং জাপানের মূল ভূখণ্ডে মিত্র শক্তির সেনা নামার কোন ব্যবস্থা হয় নি, সেহেতু প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁর সমর নায়কদের পরামর্শ নেন। জাপানের শক্তি এবং জাপানি সেনার আত্মরক্ষার ক্ষমতা লক্ষ্য করে মার্কিন সেনাপতিরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে—(১) জাপানের শ্রেষ্ঠ স্থলসেনা মাঞ্চুরিয়ায় রাখা আছে। এই সেনাদলকে মাঞ্চুরিয়ায় আবদ্ধ রাখার জন্য সোভিয়েত শক্তির সাহায্য দরকার। (২) জাপানে অবতরণের পর হাতাহাতি যুদ্ধে জাপানের অসংখ্য সেনার মোকাবিলার মত লোকবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেই। ব্রিটেনের সেনাদল ভারতবর্ষ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যস্ত থাকবে। সুতরাং জাপানকে আত্মসমর্পনে বাধ্য করতে হলে সোভিয়েত সামরিক শক্তির সাহায্য দরকার। তখনও পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে আনবিক বোমা আসে নি। কাজেই জাপান দখলের জন্য পদাতিক সেনার দরকার হয়।

উৎঘাত করা, অস্ত্র নির্মাণ কারখানাগুলি ভেঙে ফেলা হবে। (৩) অ-কার্টেলকরণ অর্থাৎ জার্মানির দানবাকৃতি মুলধনীদের পরিচালিত বিবিধমুখী শিল্প কারখানাগুলিকে ধ্বংস করা হবে। (৪) জার্মানির পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ নীতি ঘোষণা করা হয় এবং জার্মান সামরিক বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। জার্মানিতে ভবিষ্যতে কোন সমরাস্ত্র নির্মাণ করা নিষিদ্ধ করা হয়। (৫) জার্মানির সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চল থেকে শিল্পকেন্দ্র ও যন্ত্রপাতি রাশিয়াকে তুলে নিয়ে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ নিতে সম্মতি দেওয়া হয়। (৬) পূর্ব প্রাশিয়ার একাংশ ও ডানজিগ বন্দর পোল্যাণ্ডকে এবং কোনিগসগ্রাৎস শহর রাশিয়াকে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (৭) জার্মানিকে মিত্রপক্ষের দখলদারী সেনার অধীনে রাখার জন্য ৫টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়।[১] জার্মানির পূর্বাংশ রাশিয়ায় এবং পশ্চিমাংশ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে রাখার ব্যবস্থা হয়। প্রতি অঞ্চল সেই অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতির শাসনে থাকে। চারজন সেনাপতি একত্রে 'মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদ' গঠন করেন। (৮) বার্লিন নগর যদিও সোভিয়েত এলাকার ভিতরে ছিল, বার্লিনকে ৪ ভাগে ভাগ করে অধিকার করা হয়। (৯) যতদিন না জার্মানির সঙ্গে সন্ধি হয় ততদিন অস্থায়ীভাবে পোল-জার্মান ভৌগোলিক সীমানা ওডার-নাইসী নদী বরাবর ধার্য করা হয়। (১০) পোল্যাণ্ডকে ডানজিক, আপার ও লোয়ার সাইলেশিয়া, পূর্ব ব্র্যাণ্ডেনবার্গ, পোমিরিয়ানিয়া এবং পূর্ব প্রাশিয়ার দক্ষিণভাগ দেওয়া হয়। (১১) ফ্রান্সকে আলসাস-লোরেন দেওয়া হয়। (১২) বেলজিয়াম ইউপেন ও স্যালমেডি পায়। (১৩) সুদেতেন জেলা পুনরায় চেকোশ্লোভাকিয়াকে দেওয়া হয়। (১৪) অস্ট্রিয়াকে দখলে রাখার জন্য কয়েকটি সামরিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়। (১৫) অস্ট্রিয়াকে জার্মানি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। (১৬) নাৎসী যুদ্ধপরাধীদের বিচার ও দণ্ড-দানের ব্যবস্থা করা হয়। (১৭) পরাজিত অক্ষশক্তি ও তার মিত্র দেশগুলির সঙ্গে সন্ধির খসড়া রচনার দায়িত্ব পটসডাম সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনের ওপর অর্পণ করা হয়। (১৮) পারস্য থেকে মিত্রবাহিনী অপসারণের ব্যাপারে মতৈক্য হয়।

পটসডাম সম্মেলনে মত বিরোধ

মতানৈক্য, বাদানুবাদ ও পারস্পরিক দোষারোপের মধ্য দিয়েই পটসডাম সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। ফ্লেমিং-এর মতে, পটসডাম সম্মেলনের বাহ্যিক মতৈক্যের আড়ালে ইঙ্গ-মার্কিন জোট বনাম রাশিয়ার গভীর মতানৈক্য লুকিয়েছিল। এর ফলে পটসডাম সম্মেলন থেকেই 'পূর্ব-পশ্চিম ঠাণ্ডা লড়াই' প্রকাশ্যে এসে পড়ে। পরবর্তী পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে শান্তিচুক্তি রচনার ক্ষেত্রে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। জার্মানি এই মতবিরোধের প্রধান ক্ষেত্র ছিল।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী শান্তিচুক্তিগুলি (The Foreign Ministers' Conference and the Peace Treatics after

---

১. Contemporary Europe Since 1870–Carlton Hays

ইয়াল্টার হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে তিন রাষ্ট্রপ্রধান যুদ্ধোত্তর ইওরোপে এবং যুদ্ধমান দূরপ্রাচ্য সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন— (১) যেহেতু জার্মানির পতন আসন্ন হয়, সেহেতু জার্মানি সম্পর্কে স্থির হয় যে, (ক) জার্মানির পতনের পর মিত্রশক্তি জার্মানিকে ৩টি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করে তিন শক্তির সেনাদল দ্বারা অধিকার করা হবে। এই তিন প্রধান অঞ্চল ছিল রুশ, মার্কিন ও ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল। (খ) চার্চিল ও রুজভেল্টের অনুরোধে স্টালিন রাজি হন যে, ফ্রান্সকেও জার্মানির একটি অঞ্চল দখল করতে দেওয়া হবে। কিন্তু রাশিয়া এই শর্ত আরোপ করে যে, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত অঞ্চল থেকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে ফ্রান্সকে তার অঞ্চল স্থাপন করতে দেওয়া হবে। সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চল থেকে কোন স্থান ফ্রান্সকে দেওয়া হবে না। (গ) প্রতিটি অঞ্চলে একই প্রকার আইন ও শাসন প্রবর্তনের জন্য 'কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন' স্থাপিত হবে। এতে ৪টি শক্তি যথা—ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার প্রতিনিধি থাকবে। (ঘ) জার্মানিকে নিরস্ত্রীকৃত, অ-নাৎসীকৃত, গণতান্ত্রীকৃত এবং একচেটিয়া মুনাফাভোগী কার্টেল মুক্ত করা হবে। (ঙ) সোভিয়েত নেতা স্ট্যালিন দাবী করেন যে, জার্মানিকে মিত্রশক্তির ক্ষয়ক্ষতির জন্য ২০ মিলিয়ান ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং এর অর্দ্ধাংশ রাশিয়া পাবে। চার্চিল ও রুজভেল্ট ক্ষতিপূরণ গ্রহণের সম্পর্কে নীতিগত সম্মতি দিলেও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে আপত্তি জানান।

ইয়াল্টা সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ

ইয়াল্টা সম্মেলনে পূর্ব ইওরোপ বিশেষ করে পোল্যান্ডের সমস্যা বেশি প্রাধান্য লাভ করেছিল। পোল্যান্ডের ভবিষ্যৎ মিত্রপক্ষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইয়াল্টা বৈঠকে যুদ্ধোত্তর পোল্যান্ড সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (১) জার্মানির পতনের পর 'স্বাধীন পোল্যান্ড রাষ্ট্র' গঠনের জন্য তিন প্রধান একমত হন। (২) পোল্যান্ডের পূর্ব সীমান্ত অর্থাৎ রাশিয়া ও পোল্যান্ডের সীমান্ত 'কার্জন লাইন বা রেখা' বরাবর রাখা হবে বলে স্থির হয়। এর ফলে প্রাক্-যুদ্ধকালীন পোল্যান্ডের প্রায় অর্দ্ধাংশ বা ৪৭% রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। (৩) পোল্যান্ডের পশ্চিম সীমান্ত অর্থাৎ জার্মানি ও পোল্যান্ড সীমান্ত স্টালিন 'ওডার-নীস রেখা' বরাবর দাবী করেন। কিন্তু চার্চিল ও রুজভেল্ট এতে আপত্তি জানান। শেষ পর্যন্ত এই সীমান্তের প্রশ্নটি ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবী রাখা হয়। (৪) পোল্যান্ডে কোন প্রকার সরকার স্থাপিত হবে এ সম্পর্কে তিন প্রধানের কোন নির্দিষ্ট ঐক্যমত না হলেও, একথা স্থির হয় যে, পোল্যান্ডে 'অবাধ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পোল সরকার' গঠিত হবে। সর্বসাধারণের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ব্যালট বা গোপন ভোট নেওয়া হবে। কিন্তু এই সঙ্গে স্টালিন শর্ত জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন যে, পোল্যান্ডে যে সরকার হবে তা সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি মিত্র-ভাবাপন্ন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই। অপরদিকে, চার্চিল শর্ত জোড়ার চেষ্টা করেন যে, ১৯৩৯ খ্রিঃ নাৎসী আক্রমণের সময় পোল্যান্ডের যে বৈধ

ইয়াল্টা বৈঠকে যুদ্ধোত্তর পোল্যান্ড সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

এমতাবস্থায় ইয়াল্টা বৈঠকে রুজভেল্ট অনুরোধ করেন যে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়াকেও যোগ দিতে হবে। স্টালিন এক্ষেত্রে প্রথমে রাশিয়ার যোগ দেওয়ার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে কারণ দেখান যে রাশিয়া রণক্লান্ত, রুশ জনমত আর যুদ্ধ চায় না। শেষ পর্যন্ত তিনি বলেন যে, যদি তাঁর কয়েকটি শর্ত পূরণ করা হয় তবে তিনি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিবেন। রুজভেল্ট স্ট্যালিনের এই গোপন শর্তগুলি স্বীকার করেন। শর্তগুলিতে বলা হয় যে—(১) বর্হি-মঙ্গোলিয়ায় স্থিতাবস্থা (অর্থাৎ রাশিয়ার প্রাধান্য) স্বীকৃত হবে। (২) কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে রাশিয়ার আধিপত্য স্বীকার করা হবে। (৩) শাখালিন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ ভাগ রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে হবে। (৪) মাঞ্চুরিয়ায় রুশ সেনার অবস্থান স্বীকৃতি পাবে। (৫) দক্ষিণ মাঞ্চুরিয় রেলপথ, পোর্ট আর্থার, ডাইরেন বন্দর দ্বয় রুশ-চিন দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে থাকবে। (৬) মাঞ্চুরিয়ার ওপর চিনের আধিপত্য রাশিয়া স্বীকার করবে। এই শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়া দূরপ্রাচ্যে জাপানের বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশে রাজী হয়।

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার স্টালিনের শর্তাবলী

ইয়াল্টা বৈঠকে জাতিপুঞ্জ বা U.N.O. গঠন সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন-রুশ মত বিনিময় হয়। স্টালিন জাতিপুঞ্জে সোভিয়েত রাশিয়ার যোগদান সম্পর্কে শর্ত আরোপ করেন যে, জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া বাইলো রাশিয়া ও ইউক্রেনের স্বতন্ত্র আসন ও ভোটাধিকার থাকবে। মার্শাল স্টালিন এই দাবীর দ্বারা সোভিয়েত স্বার্থ এবং জাতিপুঞ্জে সোভিয়েত গরিষ্ঠতা রক্ষার চেষ্টা করেন। রুজভেল্ট ও চার্চিল এই দাবী স্বীকার করেন।

জাতিপুঞ্জের গঠন সম্পর্কে রাশিয়ার দাবী

এইভাবে ইয়াল্টা বৈঠকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ব সম্পর্কে তিন প্রধান কিছু কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেন। ইয়াল্টা সম্মেলন থেকে ফিরবার পর রুজভেল্ট ঘোষণা করেন যে—"ক্রিমিয়ার সম্মেলন থেকে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এসেছি যে, শান্তি স্থাপনের পথে আমরা শুভযাত্রা আরম্ভ করেছি"। চার্চিলও তাঁর মার্কিন সহযোগীর মতের প্রতিধ্বনি করে হাউস অফ কমন্সে বলেন যে—"আমি বিশ্বাস করি, এই পার্লামেন্ট একথা অনুভব করবে যে, যে বন্ধন তিন শক্তিকে গ্রথিত করেছে এবং তাদের পারস্পরিক আস্থা সৃষ্টি করেছে তা আরও দৃঢ় হবে"।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের মৃত্যুর পর ইয়াল্টা সম্মেলনের নেতাদের মধ্যে আস্থার অভাব

কিছুদিনের মধ্যে ইয়াল্টার উচ্চাশা ও আদর্শবাদ লুপ্ত হয় এবং পূর্ব ও পশ্চিমী শক্তিগুলির মধ্যে নগ্ন ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও ঠাণ্ডা লড়াই যুদ্ধকালীন মিত্রতার পরিবেশকে কলুষিত করে। ইয়াল্টার অব্যবহিত পরেই রুজভেল্টের অকস্মাৎ মৃত্যু হয় (এপ্রিল, ১৯৪৫ খ্রিঃ)। উপরাষ্ট্রপতি হ্যারী ট্রুম্যান মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদে বসেন। এদিকে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনে চার্চিল ও তাঁর দল পরাস্ত হয়। শ্রমিক দলের জয়লাভের লে এই দলের নেতা ক্লেমেন্ট এটলী ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হন। এই দুই নেতা ছিলেন

হন যে, তিনি রাশিয়াকে সবদিক থেকে সহযোগিতা করবেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। Fleming লিখেছেন—"The two established a basis of respect and confidence which augured well for the years after war"।[১]

VII. ১৯৪৪ খ্রিঃ 'ডাম্বারটন ওকসে' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, চিনের প্রতিনিধিরা এবং পরে রাশিয়া যোগ দেয়। এই বৈঠকে একটি আন্তর্জাতিক জাতিপুঞ্জ গঠনের পরিকল্পনা করা হয়।

VIII. ১৯৪৪ খ্রিঃ সেপ্টেম্বর মাসে 'কুইবেকের সম্মেলনে' মিলিত হয়ে রুজভেল্ট ও চার্চিল জার্মানির অধিকৃত অঞ্চল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন। অবশেষে স্টালিন ও তাঁর বিদেশমন্ত্রী মলোটোভ যোগ দিলে স্থির হয় যে, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ায় রুশ সেনার দখলদারী ও গ্রিসে ব্রিটেনের সেনার দখলদারী মেনে নেওয়া হবে।

ইয়াল্টা সম্মেলন ও ইয়াল্টা চুক্তি, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ খ্রিঃ (The Yalta Conference and the Yalta Pact) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কিভাবে বিশ্বশান্তি স্থাপিত হবে সে বিষয়ে বিজয়ী শক্তিগুলি যেমন আগ্রহ দেখায় এবং পূর্ব-পরিকল্পনা প্রস্তুত করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী শক্তিগুলির মধ্যে সে রকম আগ্রহ দেখা যায় নি।

ইয়াল্টা সম্মেলন

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ছিল, তা জার্মান আক্রমণের চাপে কিছুকাল চাপা থাকলেও, জার্মানির পতন আসন্ন হলে পুরাতন ফাটল আবার দেখা দেয়। যাই হোক, আপাততঃ জার্মানির পতন যেহেতু আসন্ন হয়, সেহেতু ইওরোপের পুনর্গঠনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধানের জন্য নেতারা ইয়াল্টায় সমবেত হন (১৯৪৫ খ্রিঃ)। এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ১৯৪৫ খ্রিঃ ৪—১১ ফ্রেবুয়ারি তিন প্রধান রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্টালিন রাশিয়ার 'ক্রিমিয়া প্রদেশের ইয়াল্টা নগরীতে' সমবেত হন। এই সম্মেলন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তিন রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ভাগ্য-নিয়ন্তা। তাঁদের সাহায্যের জন্য ইয়াল্টায় বিভিন্ন পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা যথা—মলোটোভ, ইডেন ও ষ্টেটিনাস আসেন। সামরিক বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে সমরবিশারদরা আসেন। তাছাড়া রাষ্ট্রপ্রধানদের সেনাপতিগণ ও বহু বিশেষজ্ঞ, আইনবিদ ও কূটনীতিক এই সম্মেলনে যোগ দেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার সময় ইয়াল্টার মত এত আড়ম্বরপূর্ণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ মিত্রপক্ষীয় সম্মেলন আর হয় নি। ঐতিহাসিক ফ্লেমিং (Fleming)-এর মতে ইয়াল্টা সম্মেলনে তিন রাষ্ট্রপ্রধান অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা করেন। রুজভেল্ট এই সময় স্টালিনের প্রতি আস্থা দেখান।[২] চার্চিল তাঁর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন যে, রুশ সরকার তাঁদের প্রতি অসাধারণ আতিথেয়তা ও সৌজন্য দেখান।[৩]

---

১. Flaming, P. 142.
২. From Yalta to Vietnam–David Horowitz
৩. History of Second World War–W. Churchill

ততদিনে আবার কূটনৈতিক আবহাওয়ার বদল ঘটেছে। ইওরোপের যুদ্ধ তখন শেষ। ইংলণ্ড ও আমেরিকা যুদ্ধোত্তর বিশ্বব্যবস্থায় প্রাধান্য ফিরে পেতে চাইছে, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। কাজেই তাদের সোভিয়েত বিদ্বেষ ক্রমবর্ধমান প্রকট হয়। কার্যত যুদ্ধকালীন মহাজোট তখন প্রায় বিলীন হতে বসেছে। এই সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমী শক্তিগুলির মধ্যে নানা বিষয়ে মত পার্থক্য দেখা দেয়।

আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, চিন ও সোভিয়েত রাশিয়া—এই পাঁচটি শক্তি পটসডাম সম্মেলনে যোগ দেয়। এই সম্মেলনে প্রায় প্রতিটি বিষয়েই সোভিয়েত প্রতিনিধির সঙ্গে পুঁজিবাদী পশ্চিমী দেশগুলির প্রতিনিধিদের তীব্র মনোমালিন্য দেখা দেয়। এই সম্মেলনে যুদ্ধকালীন পুরাতন নেতাদের মধ্যে একমাত্র স্টালিন ছিলেন। চার্চিল নির্বাচনে পরাস্ত হওয়ায় এই সম্মেলন ত্যাগ করেন। তাঁর স্থলে বিজয়ী শ্রমিক দলের নব-নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী এটলী যোগ দেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর পদের উত্তরাধিকারী রূপে হ্যারী ট্রুম্যান পটসডাম সম্মেলনে যোগ দেন। নতুন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের মনোভাব সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি নমনীয় ছিল না। তাঁর আদেশে আমেরিকার পারমাণবিক গবেষণা জোরালো করে তোলা হয়েছিল। পটসডাম সম্মেলন চলাকালেই ২৪ জুলাই ট্রুম্যান জাপানের ওপর আনবিক বোমা নিক্ষেপের নির্দেশ জারি করেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক পি. এম. এস. ব্ল্যাকেট এ সম্বন্ধে বলেছিলেন, "আনবিক বোমাবর্ষন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ সামরিক পদক্ষেপ, তার চাইতে অনেক বেশি রাশিয়ার সঙ্গে ঠাণ্ডা লড়াই-এর প্রথম কূটনৈতিক চাল।" ঐতিহাসিক ফ্লেমিং বলেন যে, পুরাতন নেতাদের মধ্যে একটি পরস্পরিক আস্থা ও বোঝাপড়া ছিল। স্টালিনের সঙ্গে নতুন নেতাদের সে রকম কিন্তু ব্যক্তিগত আন্তরিকতা ও আস্থা ছিল না। এটা বেশ খারাপ ব্যাপার ছিল সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে, এই সম্মেলনে নেতাদের মধ্যে বিস্তর মত-পার্থক্য দেখা দেয়। (১) জার্মানির সঙ্গে শান্তি চুক্তি রচনার ব্যাপারে ইঙ্গ-মার্কিন ও রুশ নেতাদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত তিন নেতা ঘোষণা করেন যে, বিজয়ী শক্তিদের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে শান্তি চুক্তির খসড়া রচনা করা হবে। (২) পটসডাম সম্মেলনে জার্মানিকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, জার্মান জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করা হবে। (৩) জার্মানির অ-নাৎসীকরণ, অ-সামরিকীকরণ, গণতান্ত্রিকরণ ও জার্মান শিল্প কোম্পানি বা কার্টেলগুলিকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই কথাগুলির ব্যাঞ্জনা বেশ ব্যাপক ছিল। (ক) অ-নাৎসীকরণের অর্থ ছিল জার্মানি থেকে নাৎসী সমরবাদ, নাৎসী সংস্কৃতি, জাতিগত অহমিকাবোধ, নাৎসীবাদী ইতিহাস প্রভৃতি নির্মূল করা হবে; যাতে ভবিষ্যতে পুনরায় এই ক্ষতিকারক আদর্শবাদ জার্মানিতে শিকড় বিস্তার না করতে পারে। (খ) জার্মানিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সহনশীলতা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব, অবাধ নির্বাচন, নাগরিক স্বাধীনতা প্রভৃতির পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করা হবে। (গ) অ-সমরিকীকরণ, অর্থাৎ জার্মানিকে নিরস্ত্র করা, সামরিক কলেজগুলিকে

পটসডাম সম্মেলনে বিভিন্ন সিদ্ধান্তসমূহ

দাঁড় করান হয়, সেটি আসলে ছিল এক বাহ্যিক আবরণ মাত্র। এর পিছনে ছিল দুই মহাশক্তির দুনিয়া-জোড়া অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিষ্ঠার এক উদগ্র আকাঙ্খা।

ঠাণ্ডা লড়াই-এর আরো কিছু আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, প্রতিদ্বন্দ্বী দুই শক্তির যে মূল ভূখণ্ডে অবস্থান —অর্থাৎ আমেরিকা ও ইওরোপ, সেখানে ঠাণ্ডা লড়াই যতই উত্তেজনার সঞ্চার করুক না কেন, দুই তরফেই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল, যাতে শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত, শিল্পোন্নত ঐ ভূখণ্ডে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম যেন না ঘটে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীই পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত, সদ্য-স্বাধীন, দুর্বল ও জাতিদ্বন্দ্ব-গৃহযুদ্ধ জীর্ণ দেশগুলিকে বেছে নিয়েছিল। মিশর, কিউবা, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন তথা মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রত্যক্ষ নতুবা পরোক্ষ মদত যুগিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের 'প্রভাব-বলয়ের' (Sphere of influence) প্রসার ঘটাতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিল। দ্বিতীয়ত, মুখোমুখি যুদ্ধে না নেমেও দুই বৈরী শিবির তলে তলে বিপক্ষকে আক্রমণ করা ও তার আক্রমণ প্রতিহত করা এবং উভয় প্রকার ক্ষমতা আয়ত্ত করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল। এর ফলে প্রবল থেকে প্রবলতর শক্তি-সম্পন্ন মারণাস্ত্র যেমন— হাইড্রোজেন বোমা, পারমাণবিক বোমা, নাপাম বোমা, উন্নততর ক্ষেপণাস্ত্র, রাসায়নিক অস্ত্র প্রভৃতি তৈরী ও পরীক্ষার এক নাগাড়ে প্রচেষ্টা দুই শিবিরেই চলতে থাকে। একে অপরকে ফেলে এগিয়ে যাওয়া এবং সেজন্য যতদূর সম্ভব ঝুঁকি নেওয়া, এমনকি নিজেদের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনতেও দুই পক্ষই প্রস্তুত ছিল। তৃতীয়ত, ঠাণ্ডা লড়াই শুধু আন্তর্জাতিক স্তরে আবদ্ধ বৃহৎ শক্তিসমুহের একটা সংঘাত হিসাবে দেখাই যথেষ্ট নয়। উপনিবেশ-উত্তর পর্বে তৃতীয় দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ জাতীয় ইতিহাসের ওপরেও দেখা গেছে তার অশুভ ছায়া।

ঠাণ্ডা লড়াই-এর আরো আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য

ঐতিহাসিক এরিক হবসবম্ তাঁর 'The Age of Extremes' গ্রন্থে ঠাণ্ডা লড়াই-এর একটি অভিনব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, এই পর্বে নতুন করে বিশ্বযুদ্ধের কোনো আশঙ্কা ও সম্ভাবনা ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকেই দুই Super Power-এর মধ্যে আধুনিক বিশ্ব ভাগাভাগি হবার দরুণ ক্ষমতার ভারসাম্য সেভাবে বিঘ্নিত হয় নি। দুই Super power-এর মধ্যে এক প্রকার 'অঘোষিত বোঝাপড়া' হয়ে গিয়েছিল যে সোভিয়েত রাশিয়া তার লালফৌজ-অধিকৃত এবং কমিউনিস্ট শাসনে থাকা অন্যান্য দেশগুলির ওপর কর্তৃত্ব করবে। অন্যদিকে আমেরিকা অবশিষ্ট বিশ্বকে বিশেষত পূর্বতন ঔপনিবেশিক শক্তির অধীনস্থ দেশগুলির ওপর তার প্রভাব বিস্তার করবে। এই দুই Super Power-এর কেউই নতুন করে সামরিক শক্তির জোরে নিজ নিজ প্রভাব বলয়ের প্রসার ঘটাবে না। ঠাণ্ডা লড়াই-এর সময়কালে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটে নি। ("The

ঠাণ্ডা লড়াই-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এরিক হবসবম-এর মতামত : সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অঘোষিত বোঝাপড়া

III. বুলগেরিয়ার সঙ্গে সন্ধির দ্বারা (১৯৪৭ খ্রিঃ) বুলগেরিয়া দক্ষিণ দোব্রজা লাভ করে। গ্রিসকে ৪৫ মিলিয়ান ও যুগোস্লাভিয়াকে ২৫ মিলিয়ান ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। বুলগেরিয়ার সৈনসংখ্যা হ্রাস করা হয়।

বুলগেরিয়ার সঙ্গে সন্ধি

IV. হাঙ্গেরি ৩০০ মিলিয়ান ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়।[১] এর বেশির ভাগ অর্থ রাশিয়া পায়। ট্রানসিলভ্যানিয়া প্রদেশ রুমানিয়াকে ছেড়ে দেয়। হাঙ্গেরী তার রাজ্যের অন্তর্গত দানিয়ুর নদীর দক্ষিণ ভাগ চেকোশ্লোভাকিয়াকে ছেড়ে দেয়। হাঙ্গেরীর সৈন্যবল হ্রাস করা হয়।

হাঙ্গেরির সঙ্গে সন্ধি

V. ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে সন্ধির দ্বারা কোটসামো, কারেলিয়া ও উপসাগরীয় কিছু অঞ্চল ফিনল্যাণ্ড সোভিয়েত রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে হয়। এছাড়া পোরখান অঞ্চলও রাশিয়াকে দিতে হয়। ফিনল্যাণ্ড ১৯৪১ খ্রিঃ সীমারেখা লাভ করে। ফিনল্যাণ্ডের উপকূলে রাশিয়াকে একটি নৌ–ঘাঁটি লীজ দিতে হয় এবং ৩০০ মিলিয়ান ডলার ক্ষতিপূরণ রাশিয়াকে দিতে হয়। ফিনল্যাণ্ডের অস্ত্রবল হ্রাস করা হয়।

ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে সন্ধি

VI. জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্থাপনের ব্যাপারে সোভিয়েত মন্ত্রী মলোটোভের সঙ্গে মার্কিন মন্ত্রী বার্নেস ও ব্রিটেনের কেভিনের সঙ্গে তীব্র মতভেদ ও বাদানুবাদের ফলে এই দুটি দেশের সঙ্গে সন্ধি রচনা আপাততঃ স্থগিত থাকে।

জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্থগিত

ঠাণ্ডা লড়াই-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা (Initiation of the Cold War): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ১৯৪১ খ্রিঃ থেকে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যে রুশ-মার্কিন-ব্রিটিশ মিত্রজোট গঠন করা হয়, এই মিত্রজোট পারস্পরিক সহায়তার দ্বারা অক্ষশক্তির পতন ঘটায়। জার্মানির পতনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন অবিশ্বাস মাথা তুলে দাঁড়ায়। ইয়াল্টা বৈঠকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও চার্চিল শেষবারের মত মিলিত হন (৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫ খ্রিঃ)। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি স্টালিনের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্তরে বোঝাপড়া করে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। ইয়াল্টা সম্মেলনে স্ট্যালিনের কয়েকটি দাবি-দাওয়াকে রুজভেল্ট মেনে নিয়েছিলেন এবং এই কারণে রুজভেল্টকে যথেষ্ট সমালোচনারও সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বলা চলে যে, রুজভেল্টের এই জাতীয় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার জন্য উভয় পক্ষে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক বজায় ছিল। রুজভেল্ট সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সব সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রুজভেল্ট বিশ্বাস করে গেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সমঝোতা সম্ভব। ইয়াল্টা থেকে ফিরে আসার পর

পুরাতন নেতাদের অকস্মাৎ পরিবর্তনের ফলে মিত্র শক্তির মধ্যে যুদ্ধকালীন বোঝাপড়া নষ্ট হয়

---

১. Contemporary Europe Since 1870–Carlton Hays

peculiarity of the Cold War was that speaking objectively, no imminent danger of World War existed. More than this, inspite of the apocalyptic rhetoric, on both sides, but especially on the American side, the Governments of both the super powers accepted the global distribution of force at the end of the Second World War, which amounted to a highly uneven but essentially unchallenged balance of power. The USSR controlled, or exercised pre-dominant influence in one part of the globe–the Zone occupied by the Red Army and/or another Communist armed forces at the end of the war, and did not attempt to extend in range of influence further by military force. The USA exercised control and predominance over the rest of the Capitalist World as well as the western hemisphere and the oceans, taking over what remained of the old imperial hegemony of the former colonial powers. In return, it did not intervene in the zone of accepted Soviet hegemony."

ঠাণ্ডা লড়াই-এর পটভূমি ও সূচনা (Background and onset of the Cold War) : ঠাণ্ডা লড়াই ঠিক কখন শুরু হয়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্ক আছে। মার্কিন কূটনীতিবিদ Charles Bohlen (চার্লস বোলেন) মনে করেন বহু পূর্ব থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঠাণ্ডাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। V. K. Malhotra লিখেছেন—"The roots of the strained relations between Soviet Russia and the West go back to the very hour of birth of the former in 1917, when the Western nations including U.S.A, intervened in the Civil War in Russia in the aid of a counter revolution which might nip Communism in the bud."।[১]

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় বলশেভিক পার্টির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ঠাণ্ডা লড়াই-এর জন্ম বলে অনেক ঐতিহাসিক বলে থাকেন। বলশেভিক পার্টির মতাদর্শ মার্কসবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত যা পুঁজিবাদের তীব্র বিরোধিতা করে ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন সহ সমস্ত উদারনীতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মনে করে যে মার্কসবাদ- লেনিনবাদ- বলশেভিকবাদ প্রভৃতি সবকিছু হল সামূহিকতাবাদের নামান্তর মাত্র। অর্থাৎ এরা গণতন্ত্র ও উদারনীতিবাদকে অস্বীকার করে। তাই প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে সোভিয়েত রাশিয়ার আত্মপ্রকাশ আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। ইওরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলি ও আমেরিকা সাম্যবাদী রাশিয়াকে মানতে পারে

১. International Relation–V. K. Malhotra, P. 217.

প্রয়োগ না করেও যে যুদ্ধ-উত্তেজনা ও প্রবল স্নায়ুর চাপ-জনিত দমবন্ধকর নজির বিহীন পরিস্থিতি তৈরি করা যায় তা Cold War-এর সময়কালে লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পিছনে পারস্পরিক ক্ষমতাবাদ, অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সামরিক স্বার্থবাদই বড় কারণ

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কারণ হিসাবে অনেকে 'মার্কিন গণতন্ত্রবাদ বনাম রুশী সমাজতন্ত্রবাদের সংঘাত' বলে থাকেন। দুই পক্ষের পরস্পর-বিরোধী আদর্শবাদকেই অনেকে ঠাণ্ডা লড়াই-এর মূল কারণ বলেন। মার্কিন নেতারা বলেন যে, রুশী সর্বগ্রাসী একনায়কতন্ত্র থেকে তাঁরা পৃথিবীকে মুক্ত রাখতে চান এবং গণতন্ত্র রক্ষা করতে চান। এজন্য মার্কিন প্রচার দপ্তর বিশ্বকে Free অর্থাৎ 'কমিউনিস্ট-অধিকারমুক্ত', Unfree অর্থাৎ 'সোভিয়েত কবলিত' অঞ্চলে ভাগ করেন। তাঁরা বলেন যে, তাঁরা অর্থাৎ গণতন্ত্র, অনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, ব্যক্তির অধিকার রক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে Free World 'মুক্ত দুনিয়াকে রক্ষা' করতে চান। এর জবাবে সোভিয়েত প্রচারযন্ত্র যুক্তি দেখান যে : (১) এই 'তথাকথিত স্বাধীনতা' হল ভুয়া। এই Freedom বা স্বাধীনতা হল অনশন ও মৃত্যুবরনের স্বাধীনতা। (২) কারণ মার্কিন আদর্শে ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি নেই। সম্পত্তির অধিকারকে রক্ষা করার ফলে ধন-বন্টনের ব্যবস্থা নেই। কাজেই গরীব ও ধনীর প্রভেদ থাকায় গরীবরা শোষিত হয়। (৩) সমাজতন্ত্রে 'কর্মের অধিকার' স্বীকৃত হওয়ায় ব্যক্তির জীবিকা অর্জনের অধিকার স্বীকার করা হয়। (৪) ধনতান্ত্রিক সমাজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। পুঁজিবাদ শুধু স্বদেশের লোকেদের শোষন করে মুনাফা লোটে না, উপনিবেশ বা সাম্রাজ্যের মাধ্যমে তা ব্যাপক সম্পদ লুট করে আনে। সুতরাং 'পশ্চিমী গণতন্ত্র' সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করতে চায়; সোভিয়েত রাশিয়া নিপীড়িত জাতিকে 'সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তি দিতে' চায়। এই প্রচার দ্বারা সোভিয়েত রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে বিশ্বে জনপ্রিয়তা দানের চেষ্টা করে। কার্যত ভিয়েতনামে, চিনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে রাশিয়া সাহায্য দিয়ে এই আদর্শকে বাস্তব আকৃতি দিতে চেষ্টা করে। মার্কিন প্রচার যন্ত্র সোভিয়েত প্রচারের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে এই প্রচারকে সোভিয়েত রাশিয়ার 'আদর্শবাদী আগ্রাসন' (Ideological Imperialism) বলে অভিহিত করে। মার্কিন দেশ বলে যে, পূর্ব ইওরোপে অধিকৃত দেশগুলির ওপর রুশ একনায়কতন্ত্র ও জবরদস্তি প্রমাণ করে যে, রাশিয়া প্রকৃতপক্ষে যা প্রচার করে তার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। অভিযোগ করা হয় যে, রাশিয়া গণতন্ত্রে প্রকৃত বিশ্বাসী নয়। আসলে আদর্শবাদকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের স্বার্থে ব্যবহার করা হয়। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পশ্চাতে পারস্পরিক ক্ষমতাবাদ, অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সামরিক স্বার্থবাদই বড় কারণ ছিল। দুই শক্তি যুদ্ধোত্তর বিশ্বে নিজ নিজ প্রভাব বিস্তারের জন্যই ঠাণ্ডা লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয়। আদর্শ ও জাতীয় স্বার্থের মধ্যে বিরোধ হলে প্রত্যেকে স্বার্থকেই বড় করে দেখে। তাই বলা যায়, এই সংঘাতের সপক্ষে যে পশ্চিমী পুঁজিবাদ বনাম সাম্যবাদ —এই দুই বিপরীতধর্মী আদর্শ ও অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে চলার সংঘাত অর্থাৎ আদর্শের লড়াই-এর অজুহাত

bids for power and from jeopardizing his relations with his war-time allies"।[১] Gar Alperovitz তাঁর 'Atomic Diplomacy' গ্রন্থে বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আনবিক বোমার একচেটিয়া অধিকারী হওয়ায় তার মনে অদম্য আত্মবিশ্বাস ও অহঙ্কার দেখা দেয়—তাই যুদ্ধকালীন সহাবস্থান নীতির প্রতি নিরাসক্ত হয়ে ওঠে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের আচরণ ও কাজকর্মে এই মানসিক পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখা দেয়। তিনি মনে করেন ট্রুম্যানের 'সংঘাতপূর্ণ নীতি' (Policy of Confrontation) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আনবিক বোমার একচেটিয়া মালিকানা-জনিত গগনচুম্বী আত্মবিশ্বাস ও অহমিকা ঠাণ্ডা লড়াই-এর পথ প্রস্তুত করেছিল। সংশোধনবাদীদের মতামত অনুসারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কালে রাশিয়ার অর্থনীতি ভীষনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার আগেই পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হয়েছিল। তাই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উদ্ভবের ক্ষেত্রে রাশিয়াকে দায়ী করা যুক্তিযুক্ত নয়।

সংশোধনবাদীরা মনে করেন যে, আমেরিকার বেশ কিছু কাজকর্ম সোভিয়েত রাশিয়াকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আনবিক বোমা তৈরি বিষয়ক তার 'ম্যানহাটন প্রকল্প' সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নকে কোনভাবে ইঙ্গিত দেয় নি। যুদ্ধের পর আমেরিকা তার প্রভাবাধীন দেশগুলিতে আলাদাভাবে ইতালিতে পূর্বতন নাৎসী-সহযোগীদের সমর্থন করলে রাশিয়ার সন্দেহ হয়। এই সময় আমেরিকা ও তার পশ্চিমী মিত্ররা ক্ষতিপূরণ আদায়ের সোভিয়েত দাবিকে নস্যাৎ করে সঠিক কাজ করে নি। আমেরিকা কর্তৃক বিশ্বের অনেক দেশের সমরবাদী ও স্বৈরতান্ত্রিক সবকারকে সমর্থন রাশিয়া পছন্দ করে নি।

আমেরিকার কিছু কাজকর্ম রাশিয়াকে ভাবিয়ে তুলে

Gabriel Kolko (গ্যাব্রিয়েল কলকো) তাঁর গ্রন্থে (The Politics of War : The World and United States Foreign Policy, 1943–1945) ঠাণ্ডা লড়াইয়ের চরিত্র সম্বন্ধে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে আমেরিকা বিশ্বের প্রধানতম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল এবং এই অর্থনৈতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব অর্থনীতির পরিচালিকা শক্তিতে পরিণত হতে চেয়েছিল। আমেরিকার নীতি-নির্দ্ধারকরা অর্থনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের জন্য বিদেশ নীতিকে বিন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা গণতান্ত্রিক ও মুক্তপন্থী ভাবাদর্শকে কাজে লাগিয়েছিলেন। এই ভাবাদর্শের আচরণ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আমেরিকাকে 'মুক্তিদাতা ও পরিত্রাতা' হিসাবে তুলে ধরবে বলে তাঁরা মনে করেন। কিন্তু মার্কিন বিদেশ নীতির অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণের প্রধানতম বাধা ছিল কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ, তাই কমিউনিজম-বিরোধী ক্রুশেডের মতাদর্শ উপস্থাপিত করা হয়েছিল। গ্যাব্রিয়েল

মার্কিন সম্প্রসারণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পুঁজিবাদী সমাজের আধিপত্যমূলক ধারণার অভিব্যক্তি

---

১. From Yalta to Victnam–David Horowitz, P. 87

সরকার উৎখাত হয়ে লণ্ডনে আশ্রয় নেয় ও নির্বাসিত পোলিশ সরকার গঠন করে, তাকে এই নির্বাচনে যোগদানের অধিকার দিতে হবে। শেষের দুটি শর্ত সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ইয়াল্টায় হয় নি বলে অধিকাংশ পশ্চিমী লেখক দাবী করেন। অপর দিকে সোভিয়েত লেখকেরা বলেন যে, স্টালিনের শর্ত গৃহীত হয়। অপর দিকে ১৯৪১ খ্রিঃ জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করলে পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্টদের সাহায্যে মস্কোতে একটি নির্বাসিত পোলিশ কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয়েছিল। লাল ফৌজ জার্মানি দখল করার সঙ্গে সঙ্গে এই নির্বাসিত কমিউনিস্ট সরকারকে রাশিয়া পোল্যাণ্ডে ক্ষমতায় স্থাপন করে। শেষ পর্যন্ত মার্কিন ও ব্রিটেনের প্রস্তাব ছিল যে, যদি এই কমিউনিস্ট সরকারের ভিতর লণ্ডনে নির্বাসিত সরকারের কিছু সদস্য নিতে রাজী হয়, তাহলেও চলবে। স্টালিন তাতে রাজি না হওয়ায় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের শর্ত দেওয়া হয়।

ইয়াল্টা ঘোষণাপত্রে ইওরোপীয় দেশগুলির পুনর্গঠনের মূলনীতি

তিন প্রধান ইয়াল্টার ঘোষণাপত্র দ্বারা (Yelta Communique) যে সকল দেশকে জার্মান অধিকার থেকে মুক্ত করা হবে সেই দেশগুলির পুনর্গঠনে মূলনীতি ব্যাখ্যা করেন। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয়, (১) ইওরোপে যে সকল পরিবর্তন সাধন হবে তা 'আটলান্টিক সনদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে' করা হবে। বলা বাহুল্য, আটলান্টিক সনদে বলা হয়েছিল যে, প্রতি জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অক্ষুন্ন রাখা হবে। (২) এই ঘোষণাপত্রে আরও বলা হয় যে, অক্ষশক্তির মিত্র-স্থানীয় দেশগুলির জনসাধারণকে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে যে, তাদের 'রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী গণতান্ত্রিক উপায়ে' সমাধান করা হবে। (৩) এই উদ্দেশ্যে তিন প্রধান আশ্বাস দেন যে, আত্মসমর্পণ করার পর এই দেশগুলিতে 'অন্তবর্তী সরকার গঠন' করা হবে। স্বাধীন ও অবাধ গণতান্ত্রিক নির্বাচন দ্বারা এই দেশগুলির স্থায়ী সরকার গঠিত হলে তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে এবং তাদের সঙ্গেই শান্তি চুক্তি স্থাপিত হবে।

দূরপ্রাচ্যে জাপান সম্পর্কে ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার চুক্তি

'দূরপ্রাচ্য সম্পর্কেও' ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার ইয়াল্টায় চুক্তি হয়। যেহেতু তখনও জাপান পূর্ণ উদ্যোগে যুদ্ধ চালাচ্ছিল এবং জাপানের মূল ভূখণ্ডে মিত্র শক্তির সেনা নামার কোন ব্যবস্থা হয় নি, সেহেতু প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁর সমর নায়কদের পরামর্শ নেন। জাপানের শক্তি এবং জাপানি সেনার আত্মরক্ষার ক্ষমতা লক্ষ্য করে মার্কিন সেনাপতিরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে—(১) জাপানের শ্রেষ্ঠ স্থলসেনা মাঞ্চুরিয়ায় রাখা আছে। এই সেনাদলকে মাঞ্চুরিয়ায় আবদ্ধ রাখার জন্য সোভিয়েত শক্তির সাহায্য দরকার। (২) জাপানে অবতরণের পর হাতাহাতি যুদ্ধে জাপানের অসংখ্য সেনার মোকাবিলার মত লোকবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেই। ব্রিটেনের সেনাদল ভারতবর্ষ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যস্ত থাকবে। সুতরাং জাপানকে আত্মসমর্পনে বাধ্য করতে হলে সোভিয়েত সামরিক শক্তির সাহায্য দরকার। তখনও পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে আনবিক বোমা আসে নি। কাজেই জাপান দখলের জন্য পদাতিক সেনার দরকার হয়।

স্বার্থের প্রতিফলন। ফ্লেমিং তাঁর দুই খণ্ডে রচিত "The Origin of the Cold War" গ্রন্থে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের জন্য আমেরিকান ট্রুম্যানকেই দায়ী করেছেন। ফ্লেমিং বলেছেন রুজভেল্ট অনুসৃত 'সমঝোতা ও মানিয়ে চলার নীতি' থেকে সরে এসে তাঁর উত্তরসূরি ট্রুম্যান পুরোপুরি 'সোভিয়েত বিরোধিতার নীতি' গ্রহণ করে Cold War-এর সূচনা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যতটা সম্ভব হৃদ্যতার সম্পর্ক বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। রুজভেল্টের উত্তরসূরি প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান দুর্ভাগ্যবশতঃ রুজভেল্টের আপোসপন্থী নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বিশেষ করে কমিউনিজমের ব্যাপারে ট্রুম্যান কঠোর মানসিকতার পরিচয় দেন। আমেরিকার আচরণ ছিল কঠোর। সংশোধনবাদী ব্যাখ্যাকাররা মনে করেন, স্নায়ুযুদ্ধ কিছুটা অনিবার্য ছিল ঠিকই, কিন্তু আমেরিকার সদিচ্ছা থাকলে তা এড়ানো যেত। আমেরিকার রাজনীতিবিদদের 'বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদ-বিরোধী জেহাদ' ঠাণ্ডা লড়াইকে অবধারিত করেছিল। উইলিয়াম এ উইলিয়াম বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদ-বিরোধী ক্রুশেড ঘোষণার জন্য ঠাণ্ডা লড়াই-এর সূচনা হয়। সংশোধনবাদী ব্যাখ্যার একটি বক্তব্য হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাবাধীন অঞ্চল রূপে পূর্ব ইওরোপকে ছেড়ে দিলে, সোভিয়েত রাশিয়া প্রতি-আক্রমণের পথ নিত না। অধ্যাপক ডেভিড হরোউইজ তাঁর 'From Yalta to Vietnam' গ্রন্থে বলেছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার থেকে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৫ থেকে ২০ মিলিয়ান সোভিয়েত জনগণের জীবননাশ হয়, ১৭১০টি শহর ও ৭০০০০টি গ্রাম বিধ্বস্ত হয় এবং ৩১৮৫০টি শিল্পসংস্থা ধ্বংস হয়। তাই ডেভিড হরোউইজ মনে করেন, এই অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে আগ বাড়িয়ে সম্প্রসারণের পথ নেওয়া অথবা বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদ প্রসারের পরিকল্পনা নেওয়া অকল্পনীয় ছিল। তাছাড়া পুঁজিবাদের সঙ্গে মার্কসবাদী—লেনিনবাদী তত্ত্বের সংঘাতের কথা মুখে বললেও স্টালিন সহবস্থানের ওপর জোর দিয়েছিলেন, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে তাঁর অনাগ্রহের কথা ঘোষণা করেছিলেন, অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে রাষ্ট্রীয় পুণর্গঠনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি লালফৌজের সৈন্য সংখ্যাও ৯ মিলিয়ান কমিয়েছিলেন। Hobsbawm বলেছেন, কোন মিত্র রাষ্ট্রের সংসদীয় ব্যবস্থা বা বহুদলীয় শাসন ও মিশ্র অর্থনীতি রাশিয়া জোর করে ধ্বংস করার চেষ্টা করে নি। বস্তুতপক্ষে স্ট্যালিন একটি 'আত্মরক্ষামুখী নীতি' (Self-containment) গ্রহণেরই পক্ষপাতী ছিলেন। কেবলমাত্র পার্শ্ববর্তী পূর্ব ইওরোপে রাশিয়ার স্বার্থে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক 'প্রভাবাধীন বলয়' তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আইজাক ডয়েশারের লেখা স্টালিনের জীবনী গ্রন্থে স্টালিনের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি তিনি চিন, ইতালি, ফ্রান্স, যুগোশ্লোভিয়া প্রভৃতি দেশে কমিউনিস্ট পার্টিকে সংযত আপোষমুখী নীতি অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অধ্যাপক ডেভিড হরোউইজ লিখেছেন—"He did what he could to discourage the Communist Parties from making

ততদিনে আবার কূটনৈতিক আবহাওয়ার বদল ঘটেছে। ইওরোপের যুদ্ধ তখন শেষ। ইংলণ্ড ও আমেরিকা যুদ্ধোত্তর বিশ্বব্যবস্থায় প্রাধান্য ফিরে পেতে চাইছে, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। কাজেই তাদের সোভিয়েত বিদ্বেষ ক্রমবর্ধমান প্রকট হয়। কার্যত যুদ্ধকালীন মহাজোট তখন প্রায় বিলীন হতে বসেছে। এই সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমী শক্তিগুলির মধ্যে নানা বিষয়ে মত পার্থক্য দেখা দেয়।

আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, চিন ও সোভিয়েত রাশিয়া—এই পাঁচটি শক্তি পটসডাম সম্মেলনে যোগ দেয়। এই সম্মেলনে প্রায় প্রতিটি বিষয়েই সোভিয়েত প্রতিনিধির সঙ্গে পুঁজিবাদী পশ্চিমী দেশগুলির প্রতিনিধিদের তীব্র মনোমালিন্য দেখা দেয়। এই সম্মেলনে যুদ্ধকালীন পুরাতন নেতাদের মধ্যে একমাত্র স্টালিন ছিলেন। চার্চিল নির্বাচনে পরাস্ত হওয়ায় এই সম্মেলন ত্যাগ করেন। তাঁর স্থলে বিজয়ী শ্রমিক দলের নব-নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী এটলী যোগ দেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর পদের উত্তরাধিকারী রূপে হ্যারী ট্রুম্যান পটসডাম সম্মেলনে যোগ দেন। নতুন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের মনোভাব সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি নমনীয় ছিল না। তাঁর আদেশে আমেরিকার পারমাণবিক গবেষণা জোরালো করে তোলা হয়েছিল। পটসডাম সম্মেলন চলাকালেই ২৪ জুলাই ট্রুম্যান জাপানের ওপর আনবিক বোমা নিক্ষেপের নির্দেশ জারি করেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক পি. এম. এস. ব্ল্যাকেট এ সম্বন্ধে বলেছিলেন, "আনবিক বোমাবর্ষন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ সামরিক পদক্ষেপ, তার চাইতে অনেক বেশি রাশিয়ার সঙ্গে ঠাণ্ডা লড়াই-এর প্রথম কূটনৈতিক চাল।" ঐতিহাসিক ফ্লেমিং বলেন যে, পুরাতন নেতাদের মধ্যে একটি পরস্পরিক আস্থা ও বোঝাপড়া ছিল। স্টালিনের সঙ্গে নতুন নেতাদের সে রকম কিন্তু ব্যক্তিগত আন্তরিকতা ও আস্থা ছিল না। এটা বেশ খারাপ ব্যাপার ছিল সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে, এই সম্মেলনে নেতাদের মধ্যে বিস্তর মত-পার্থক্য দেখা দেয়। (১) জার্মানির সঙ্গে শান্তি চুক্তি রচনার ব্যাপারে ইঙ্গ-মার্কিন ও রুশ নেতাদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত তিন নেতা ঘোষণা করেন যে, বিজয়ী শক্তিদের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে শান্তি চুক্তির খসড়া রচনা করা হবে। (২) পটসডাম সম্মেলনে জার্মানিকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, জার্মান জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করা হবে। (৩) জার্মানির অ-নাৎসীকরণ, অ-সামরিকীকরণ, গণতান্ত্রিকরণ ও জার্মান শিল্প কোম্পানি বা কার্টেলগুলিকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই কথাগুলির ব্যাঞ্জনা বেশ ব্যাপক ছিল। (ক) অ-নাৎসীকরণের অর্থ ছিল জার্মানি থেকে নাৎসী সমরবাদ, নাৎসী সংস্কৃতি, জাতিগত অহমিকাবোধ, নাৎসীবাদী ইতিহাস প্রভৃতি নির্মূল করা হবে; যাতে ভবিষ্যতে পুনরায় এই ক্ষতিকারক আদর্শবাদ জার্মানিতে শিকড় বিস্তার না করতে পারে। (খ) জার্মানিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সহনশীলতা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব, অবাধ নির্বাচন, নাগরিক স্বাধীনতা প্রভৃতির পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করা হবে। (গ) অ-সমরিকীকরণ, অর্থাৎ জার্মানিকে নিরস্ত্র করা, সামরিক কলেজগুলিকে

পটসডাম সম্মেলনে বিভিন্ন সিদ্ধান্তসমূহ

নবাগত এবং স্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁদের কোন যোগাযোগ ও বোঝাপড়া ছিল না। ফলে নেতাদের মধ্যে আস্থার অভাব দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, রুজভেল্টের দূরপ্রাচ্য সম্পর্কীয় ইয়াল্টা শর্তগুলি মার্কিন কংগ্রেস, মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলী বা পেন্টাগনের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এজন্য আমেরিকায় এই সমালোচনা করা হয় যে—"রুজভেল্ট ইয়াল্টায় স্টালিনের নিকট আত্মসমর্পন করেন"। (Yalta surender)। রবার্ট শেরউড মন্তব্য করেছেন যে "জার্মানি ও জাপানের পূর্ণ পরাজয়ের পর বিশ্বে যে সকল সমস্যা দেখা দেয় তার অনেকগুলিই ইয়াল্টা চুক্তি থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়।"

প্রকৃতপক্ষে, ইয়াল্টা চুক্তি সম্পর্কে এই সকল অভিযোগের কোন ভিত্তি নাই। পূর্ব-পশ্চিম ঠাণ্ডা লড়াই আরম্ভ হলে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সেই পটভূমিকায় ইয়াল্টা চুক্তিকে বিচার করে 'আত্মসমর্পণ' আখ্যা দেওয়া হয়। ট্রুম্যান ও তাঁর পরামর্শদাতারা ভুলে যান যে, পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিই ছিল ইয়াল্টা চুক্তির মূলে। রুজভেল্ট সোভিয়েত রাশিয়াকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন কেন, তার উত্তরে বলা হয় রুজভেল্ট দূরপ্রাচ্যে যুদ্ধের ব্যাপারে মিত্রপক্ষের সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন না বলে রাশিয়াকে যুদ্ধে টেনে আনতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়ার হস্তক্ষেপই দূরপ্রাচ্যে যুদ্ধকে সংক্ষিপ্ত করতে পারবে। সমালোচকদের মতে, পারমাণবিক বিস্ফোরণে সাফল্যের পর আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ঐতিহাসিক ফ্লেমিং যথার্থই যুক্তি দেখিয়েছেন, ইয়াল্টা সম্মেলনের সময়ে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। তাই কেবল রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়, মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, দূরপ্রাচ্যের যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য অবশ্যই প্রয়োজন। রুজভেল্ট চেয়েছিলেন রাশিয়ার সাহায্যে যুদ্ধকে সংক্ষিপ্ত করে অযথা রক্তক্ষয়ের অবসান ঘটানো এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। মোট কথা, জাপানের সেনাবলের বিরুদ্ধে রুশ সাহায্য পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের আগে দরকারী মনে হয়। সেজন্য দূর প্রাচ্যে কিছু সুযোগ-সুবিধা রাশিয়াকে দিতে হয়। ইয়াল্টার প্রস্তাবের সাফল্য রাশিয়ার সহযোগিতার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং রাশিয়াকে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবেই গণ্য করা যেতে পারে। অপরদিকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ইয়াল্টা চুক্তিতে কতকগুলি সমস্যার সমাধান না করে ধামাচাপা দেওয়া হয় এবং কতকগুলি সমস্যার এমন সমাধান হয় যে, পরে সে বিষয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। ইয়াল্টা চুক্তিকে রুজভেল্টের রুশ তোষন বলা না গেলেও, পোল্যাণ্ডের প্রায় ৪৭% রাশিয়াকে ছেড়ে দেওয়ার পরেও পোল্যাণ্ডে রুশ প্রভাবিত লুবলিন সরকার গঠন এবং ১৯৪৭ খ্রিঃ ইয়াল্টা চুক্তির পরে নামেমাত্র নির্বাচন করে লুবলিন সরকারের তথাকথিত বৈধতা প্রতিষ্ঠা, ইয়াল্টা চুক্তির প্রতি রুশ ন্যায় বিচারের

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইয়াল্টা সম্মেলনেই ঠাণ্ডা লড়াই-এর মুখবন্ধ রচিত হয়

লড়াইয়ের জন্য দায়ী ছিল না। উভয়ই সমানভাবে দায়ী ছিল। একথা বলা যায়, ১৯৪৫ -এর পর পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পটভূমি সৃষ্টি করেছিল।

ঠাণ্ডা লড়াই-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of the Cold War): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কালে প্রায় ৫০ বছর ধরে বিশ্ব-রাজনীতির প্রধান বিষয় ছিল Cold War বা ঠাণ্ডা লড়াই। ঐতিহাসিকগণ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের নানা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। Cold War বলতে সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'স্নায়ুযুদ্ধকে' বোঝানো হয়ে থাকে। এই লড়াই-এ দুই 'Patron State' সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুখোমুখি ট্যাঙ্ক চালায় নি বা বোমা ছোঁড়েনি; কিন্তু Client State গুলিকে জড়িয়ে নিয়ে প্রতি মুহূর্তেই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, লড়াই জারি আছে। এরিক হবস্‌বম তাঁর 'The Age of Extremes' গ্রন্থে Cold War-এর বিষয়টি আলোচনার সময় যুদ্ধ সম্পর্কে পাশ্চাত্য দার্শনিক হবসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। 'লেভিয়াথান'-এ হবস্ বলেছেন, যুদ্ধ বলতে কেবল শক্তির দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ইত্যাদিকেই বোঝানো হয় না বরং একটি সময়সীমাকে তিনি চিহ্নিত করেন যার মধ্যে যুদ্ধের বাসনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। (War consisteth not in battle only, or the act of fighting, but in a tract of time, wherein the will to contend by battle is sufficiently known)।[১] হবস্‌বমের মতে, আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে সম্পর্ককে এই জাতীয় একটি সমর বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধকে Cold War বলা হয়

ঠাণ্ডা যুদ্ধ আভিধানিক অর্থে হল স্নায়ুযুদ্ধ "A State of Political hostility existing between the Soviet bloc countries and the Western powers after the Second World War." দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুই মহাশক্তিধর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জগতে উপস্থিত হয়ে বিশ্ব-রাজনীতিকে উত্তপ্ত ও উত্তেজনাপ্রবণ করে রেখেছিল। সেই পরিস্থিতিকে বোঝানোর জন্যই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা 'স্নায়ুযুদ্ধ' কথাটি ব্যবহার করে থাকেন। অর্থাৎ ঠাণ্ডা লড়াই যুদ্ধ হলেও কোন অবস্থায় একে সত্যিকারের যুদ্ধ বলা যায় না। কারণ প্রকৃত যুদ্ধে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যে এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত ছিল। স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধের পরিবেশ আছে কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ নেই। যুদ্ধের প্রস্তুতি আছে কিন্তু যুদ্ধ নেই। উভয় পক্ষ যুদ্ধ করার জন্য উন্মুখ কিন্তু কোন পক্ষই যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চায় না। সমরাস্ত্র

ঠাণ্ডা লড়াই হল স্নায়ুযুদ্ধ যাতে যুদ্ধ-উত্তেজনা ও প্রবল স্নায়ুর চাপজনিত দমবন্ধকর পরিস্থিতি তৈরি করে

---

১. Hobbes, Chapter 13, The Age of Extrems-E. Hobsbawn, P. 226

বাড়াতে সোভিয়েত রাশিয়া যে 'আধিপত্যবাদী নীতি' গ্রহণ করেছিল তা ঠাণ্ডা লড়াইকে অনিবার্য করে তুলেছিল। ঐতিহ্যগত ঐতিহাসিকদের মত অনুসারে, সোভিয়েত রাশিয়া সমস্ত রকম সহযোগিতা নস্যাৎ করে দেওয়ার ফলে দুই গোষ্ঠীতে ইওরোপের বিভাজন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। ঐতিহ্যবাহী ভাষ্যকারগণ বলেছেন, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারী স্টালিন এক ভাষণে কমিউনিজম ও পুঁজিবাদে মৌলিক বৈপরীত্য ও সংঘাতের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর ভাষনের প্রতিবাদ্য বিষয় ছিল যে, সাম্যবাদ জয়ী না হওয়া পর্যন্ত কমিউনিজম ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ অপ্রতিরোধ্য।

রক্ষণশীল মতবাদের প্রচারকরা স্টালিনকে তাঁর নানা নীতি ও কর্মপদ্ধতি উল্লেখ করে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের জন্য দায়ী করেছেন। যেমন, স্টালিন 'কমিনফর্ম' গঠন করেছিলেন, চেকোশ্লোভাকিয়ায় বামপন্থী অভ্যুত্থানকে মদত দিয়েছিলেন, ইতালি ও ফ্রান্সে কমিউনিস্ট পার্টিকে জঙ্গি পথের দিশা দেখিয়েছিলেন। তাঁর এইসব কূটনৈতিক কার্যকলাপ আমেরিকাকে আতঙ্কিত করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সংকট সৃষ্টির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের দায়িত্বকেই উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপের প্রায় অধিকাংশ অঞ্চল লালফৌজের হস্তগত হয়েছিল এবং বাকি অংশের ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ছিল। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতি রোধের চেষ্টা করতে থাকে। ঠাণ্ডা লড়াই সম্পর্কে traditional ব্যাখ্যায় সোভিয়েত পক্ষ ও মার্কিন পক্ষের দ্বন্দ্বে আদর্শের বৈপরীত্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

স্টালিনকে ঠাণ্ডা লড়াই-এর জন্য দায়ীকরণ

সংশোধনবাদী মতামত (Revisionist view) ঃ বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের চরিত্র ও দায়িত্ব নিয়ে সংশোধনবাদী ব্যাখ্যা শুরু হয়েছিল। এই চিন্তাধারার পথ-প্রদর্শক ছিলেন 'The Cold War' গ্রন্থের রচয়িতা ওয়াল্টার লিপস্যান। ঐতিহ্যবাহী ব্যাখ্যার বিরোধী সংশোধনবাদী ব্যাখ্যাকাররা ঠাণ্ডা লড়াই-এর জন্য সোভিয়েত রাশিয়া নয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকেই দায়ী করেন। ঠাণ্ডা লড়াই-এর ঐতিহ্যবাহী ভাষ্যে সোভিয়েত পক্ষ ও মার্কিন পক্ষের দ্বন্দ্বে আদর্শের বৈপরীত্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংশোধনপন্থীরা এই ব্যাখ্যার সংশোধন করেছেন। আদর্শের লড়াই নিছকই একটা লোক-দেখানো ব্যাপার, বৈধতা নির্মাণের কৌশলমাত্র। আসলে এটা ছিল একটা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার আন্তঃরাষ্ট্রিক সঞ্চায়ন—এটাই হল সংশোধনপন্থীদের মত। Gar Alperovitz, Gobriel Kolko, William Appleman William, Walter Lafeber প্রমুখ ঐতিহাসিকরা বলেছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্প্রসারণশীল নীতি নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'আগ্রাসী নীতি' Cold War-এর সূত্রপাত করেছিল। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কারণ ছিল আমেরিকার অর্থনৈতিক

সংশোধনবাদীদের মতে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের জন্য মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই দায়ী

মাসে ইয়াল্টা চুক্তির সময়কাল থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত মার্শাল স্টালিন এমন কতকগুলি কাজ করেন যে, তার ফলে পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্কে ফাটল ধরে। প্রথমত, পোল্যান্ডে লুবলিন (Lublin) সরকারকে লাল ফৌজের ছাতার নীচে শুধু আশ্রয় দেওয়া হয় নি, পোল্যান্ডে অ-কমিউনিস্ট নেতাদের বন্দী বা অন্তরীন করা হয়। স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার খর্বিত হয়। দ্বিতীয়ত, হাঙ্গেরীর কাছ থেকে সোভিয়েত রাশিয়া এক বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দাবী করে এবং ১৯৪৪ খ্রিঃ মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট ইমরেনাগির মাধ্যমে ভূমি-সংস্কার করা হয়, যাতে কমিউনিস্টদের জনপ্রিয়তা বাড়ে। তৃতীয়ত, রুমানিয়ায় ১৯৪৪ খ্রিঃ কমিউনিস্ট পার্টির মাত্র ৪০০ সদস্য ছিল। ১৯৪৪-এর মার্চ মাসে রুশ মন্ত্রী ভিসি নিস্কির হস্তক্ষেপে রুমানিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন স্থাপিত হয়। চতুর্থত, বুলগেরিয়ায় লাল ফৌজ ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করে এবং অ-কমিউনিস্টদের দমন করে। পঞ্চমত, চেকোশ্লোভাকিয়ায় কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলেও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি কমিউনিস্টরা অধিকার করে নেয়। ষষ্ঠত, যুগোশ্লাভিয়াতে স্থানীয় কমিউনিস্ট দল মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে জার্মানদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করে। স্টালিন যুগোশ্লাভ কমিউনিস্টদের নিজ পছন্দমত কমিউনিস্ট শাসন গঠনের অধিকার দেন। সপ্তমত, আলবানিয়ায় কমিউনিস্ট গেরিলাগণ সরকার দখল করে নেয়। অষ্টমত, এছাড়া পূর্ব জার্মানি ও পূর্ব অস্ট্রিয়া লাল ফৌজ দখল করায় এই স্থানগুলিতেও লাল ফৌজের ছত্রছায়ায় কমিউনিস্ট শাসন গড়ে ওঠে। মোট কথা, ইয়াল্টা চুক্তির কয়েক মাসের মধ্যেই পূর্ব জার্মানি সহ গোটা পূর্ব ইওরোপে রুশ তাঁবেদার কমিউনিস্ট শাসন স্থাপিত হয়। এই সকল স্থানে রুশ লাল ফৌজ দখলদারী থাকায় কমিউনিস্ট দলগুলি তার সুযোগ নিয়ে অ-কমিউনিস্টদের উৎখাত করে দেয়। ইয়াল্টা চুক্তিতে আটলান্টিক চার্টারের ভাবধারা অনুযায়ী এই সকল স্থানে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের কোন ব্যবস্থা হয় নি। এর ফলে যারা ইয়াল্টা চুক্তির ফলে আনন্দে আত্মহারা হয়, তারা এখন মুষড়ে পড়ে। রুজভেল্ট ইয়াল্টা চুক্তির পরিণাম দেখে অনুতপ্ত হন এবং জার্মানিতে ইঙ্গ–মার্কিন শান্তি চুক্তির শর্ত নমনীয় করতে সঙ্কল্প নেন। এজন্য স্টালিন রুজভেল্টকে ভর্ৎসনা করেন। রুজভেল্ট তদুত্তরে স্টালিনকে আমেরিকার জার্মান নীতিকে 'নক্কারজনক ভ্রান্ত ব্যাখ্যা' (Vile misrepresentations) বলে মৃদু তিরস্কার করেন। এদিকে ইয়াল্টা চুক্তি অনুযায়ী জাপান আক্রমণের জন্য রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় সেনা সমাবেশ করে। কিন্তু মার্কিন সমর বিভাগ জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরে এ্যাটম বোমা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিলে, রাশিয়াকে আর জাপানের ভূখণ্ডে নামার সুযোগ দেওয়া হয় নি। এজন্য রুশ নেতারা বিরক্তি বোধ করেন। এইভাবে ইয়াল্টা চুক্তির অব্যবহিত পরেই পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে মন কষাকষি শুরু হয়। আপাততঃ প্রধান সমস্যাগুলি, যথা—জার্মানি ও তার মিত্রদেশের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন, ইওরোপের পুনর্গঠন প্রভৃতি সমস্যার সমাধানের জন্য পটসডামের সম্মেলনে ১৭ জুলাই, ১৯৪৫ খ্রিঃ নেতারা পুনর্বার মিলিত হন। বার্লিনের কাছে পটসডাম শহরে আয়োজিত সম্মেলন ১৭ জুলাই থেকে ২ আগষ্ট, ১৯৪৫ পর্যন্ত চলেছিল।

নিদর্শণ নয় বলে বহু ঐতিহাসিক মনে করেন। আসলে পোল্যাণ্ড সংক্রান্ত ব্যাপারে ইয়াল্টা সম্মেলনে যে চুক্তি উভয় পক্ষ করেন তার মধ্যেই ভবিষ্যৎ সমস্যার বীজ নিহিত ছিল। পোল্যাণ্ড সংক্রান্ত চুক্তি ছিল একাধারে বিভ্রান্তিকর ও ত্রুটিপূর্ণ। উইলিয়ামস ও পি ও ব্রোয়স্কি মনে করেন যে, সংশ্লিষ্ট চুক্তির অস্বচ্ছতাকে উভয় পক্ষই তাদের মতো করে ব্যবহার করেছিল। Wayne C. Mc Williams & Harry Piotrowski লিখেছেন— "The ambiguity of the agreement allowed both sides to interprel it as they saw fit."[১] দ্বিতীয়ত, পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্ত জার্মানির ওডার-নাইসা নদী পর্যন্ত বিস্তারের দাবী পশ্চিমী দেশগুলি ইয়াল্টাতে ধামাচাপা দেয়। পরে এ নিয়ে বহু গণ্ডগোল হয়। লাল ফৌজ যেহেতু এই অঞ্চলে দখলদার ছিল, সেহেতু কাগজে-কলমে না হলেও হাতে-কলমে এই অঞ্চল তারা দখলে রাখে। তৃতীয়ত, জার্মানির ক্ষতিপূরণের বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে পশ্চিমী দেশের সঙ্গে রাশিয়ার তীব্র মতাবিরোধ হয়। চতুর্থত, ইয়াল্টা চুক্তির কালি শুকাবার আগেই রুশ বিদেশমন্ত্রী ভিসি নিস্কির হস্তক্ষেপে রুমানিয়ার রাজা মাইকেল তাঁর কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করে রাশিয়ার মনোনীত কমিউনিস্ট মন্ত্রীসভা গঠনে বাধ্য হন। সুতরাং ইয়াল্টা চুক্তির মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর বীজ নিহীত ছিল। ইয়াল্টা সম্মেলনে যে সমস্যাগুলি উত্থাপন করা হয়েছিল যেমন—পোল্যাণ্ড এবং যুদ্ধোত্তর কালের পোল্যাণ্ডের সীমান্ত, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, জাপানের বিরুদ্ধে লাল ফৌজের অংশ গ্রহণ, জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার প্রশ্ন ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলি পূর্ব ও পশ্চিম-শক্তিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক কেনেথ টমসন মনে করেন যে ইয়াল্টা সম্মেলনেই ঠাণ্ডা লড়াই-এর মুখবন্ধ রচনা হয়েছিল (...."Yalta became a watershed between the era of war-time cooperation and the first stories of the Cold War")।[২]

পটসডাম সম্মেলন জুলাই, ১৯৪৫ (The Potsdam Conference) : ইওরোপে যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার দু মাসের মধ্যে ১৯৪৫-এর জুলাই মাসে বিজয়ী পক্ষ পটসডামে মিলিত হয়। রুজভেল্টের মৃত্যুর পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান রুমানিয়া ও পোল্যাণ্ডে সোভিয়েত নীতি লক্ষ্য করে এই ধারণা করেন যে, সোভিয়েত রাশিয়া ইয়াল্টা চুক্তির শর্ত রক্ষা করছে না। ইয়াল্টা চুক্তি সম্পাদনের পর স্বদেশে ফিরে এসে রুজভেল্ট নিজেই আক্ষেপ করেন যে, রাশিয়া ইয়াল্টার সদিচ্ছার দাম দিচ্ছে না। ইতিমধ্যে রুজভেল্ট দেহত্যাগ করেন। মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যান রাষ্ট্রপতির পদে বসেন। তিনি ছিলেন কট্টর সোভিয়েত-বিরোধী। ১৯৪৫ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারি

পটসডাম সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমী শক্তি-গুলির নানা বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়

---

১. The World since 1945–Wayne C. Mc Williams & Harry Piotrowski, P. 33
২. Principles and Problems of International Policies–Keneth W. Thomson, 1950

কলকো মনে করেন, আমেরিকা বিশেষ করে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই তার পরিকল্পিত 'মুক্তপন্থী বাণিজ্য অর্থনীতির' ভিত্তিতে একতরফা বিশ্ব অর্থনীতিকে বেঁধে ফেলতে চেয়েছিল। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হ্যাল এই অর্থনৈতিক আধিপত্যের প্রধানতম প্রবক্তা ছিলেন। এই অর্থনৈতিক সম্প্রসারণবাদও সোভিয়েত রাশিয়াকে বিচলিত করেছিল। অধ্যাপক উইলিয়াম এ উইলিয়ামস্ তাঁর 'The Tragedy of American Diplomacy' গ্রন্থে কলকোর ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেছেন। উইলিয়ামস্ মনে করেন মার্কিন সম্প্রসারণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পুঁজিবাদী সমাজের আধিপত্যমূলক ধারণার অভিব্যক্তি দেখা দেয়।

বাস্তবধর্মী মতামত (Objective view) : বাস্তবধর্মী ভাষ্যকাররা মনে করেন ঠাণ্ডা লড়াই কোন বিশেষ ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের আগ্রাসী কার্যাকলাপের ফলে ঘটে নি। ঠাণ্ডা লড়াই ছিল কতকগুলি ঘটনার ফলশ্রুতি মাত্র। বস্তুতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে যে বিশেষ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সেই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকা পরস্পর পরস্পরের পদক্ষেপ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলে ক্রমশ উভয় পক্ষের বিদ্বেষ ও তিক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে করেকটি সংকটের সৃষ্টি হলে উভয় শক্তিজোটের মধ্যে ভীতি-জনিত মানসিকতা আরো সমস্যার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ বাস্তবধর্মী ঐতিহাসিকরা মনে করেন ঠাণ্ডা লড়াইয়ের জন্য বিশেষ কোন শক্তিকে দায়ী করা ঠিক হবে না। এরা মনে করেন ঠাণ্ডা লড়াই-এর সূচনার জন্য হয় প্রতিদ্বন্দ্বী উভয় পক্ষই দায়ী ছিল নতুবা কোন পক্ষই দায়ী ছিল না। Louis J. Halle তাঁর 'The Cold War History' গ্রন্থে ঠাণ্ডা লড়াইকে যুদ্ধ-জনিত পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত বলে সাব্যস্ত করেছেন। তাই ঠাণ্ডা লড়াই কোনমতেই আদর্শগত দ্বন্দ্ব ছিল না—রাজনৈতিক সংঘাতকে আদর্শগত সংঘাতের আবরণ দেওয়া হয়। তিনি এই স্নায়ুযুদ্ধকে চিরাচরিত ক্ষমতার দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক পুনরাবৃত্তি বলেই মনে করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে এই মর্মে বক্তব্য রেখেছেন যে, ইওরোপীয় ভারসাম্যের সংকট দেখা দেওয়ার ফলে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়। হ্যানস্ জে. মর্গ্যানথো (Hans J. Morgenthan) এবং লুই. জে. হ্যালে ঠাণ্ডা লড়াইকে মূলত ক্ষমতার রাজনীতি আর শক্তিসাম্যের সংকট থেকে উদ্ভূত একটি বিশেষ প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। বাস্তবধর্মী ভাষ্যকারদের মতে, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উৎস দুই মহাশক্তিশালী রাষ্ট্রের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থে যতটা না নিহিত ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি নিহিত ছিল পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে।

বাস্তবধর্মী মতবাদীদের মতে ঠাণ্ডা লড়াই মূলত ক্ষমতার রাজনীতি এবং শক্তিসাম্যের সংকট থেকে উদ্ভুত একটি বিশেষ প্রক্রিয়া

উপসংহার

একথা সত্য যে, ঠাণ্ডা লাড়াই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত একটি বিষয়। এ সম্পর্কে ঐতিহ্যগত এবং সংশোধনবাদী ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যায় সোভিয়েত রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করা হয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেউই এককভাবে ঠাণ্ডা

হন যে, তিনি রাশিয়াকে সবদিক থেকে সহযোগিতা করবেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। Fleming লিখেছেন—"The two established a basis of respect and confidence which augured well for the years after war"।[১]

VII. ১৯৪৪ খ্রিঃ 'ডাম্বারটন ওকসে' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, চিনের প্রতিনিধিরা এবং পরে রাশিয়া যোগ দেয়। এই বৈঠকে একটি আন্তর্জাতিক জাতিপুঞ্জ গঠনের পরিকল্পনা করা হয়।

VIII. ১৯৪৪ খ্রিঃ সেপ্টেম্বর মাসে 'কুইবেকের সম্মেলনে' মিলিত হয়ে রুজভেল্ট ও চার্চিল জার্মানির অধিকৃত অঞ্চল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন। অবশেষে স্টালিন ও তাঁর বিদেশমন্ত্রী মলোটোভ যোগ দিলে স্থির হয় যে, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ায় রুশ সেনার দখলদারী ও গ্রিসে ব্রিটেনের সেনার দখলদারী মেনে নেওয়া হবে।

ইয়াল্টা সম্মেলন ও ইয়াল্টা চুক্তি, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ খ্রিঃ (The Yalta Conference and the Yalta Pact) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কিভাবে বিশ্বশান্তি স্থাপিত হবে সে বিষয়ে বিজয়ী শক্তিগুলি যেমন আগ্রহ দেখায় এবং পূর্ব-পরিকল্পনা প্রস্তুত করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী শক্তিগুলির মধ্যে সে রকম আগ্রহ দেখা যায় নি।

ইয়াল্টা সম্মেলন

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ছিল, তা জার্মান আক্রমণের চাপে কিছুকাল চাপা থাকলেও, জার্মানির পতন আসন্ন হলে পুরাতন ফাটল আবার দেখা দেয়। যাই হোক, আপাততঃ জার্মানির পতন যেহেতু আসন্ন হয়, সেহেতু ইওরোপের পুনর্গঠনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধানের জন্য নেতারা ইয়াল্টায় সমবেত হন (১৯৪৫ খ্রিঃ)। এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ১৯৪৫ খ্রিঃ ৪—১১ ফ্রেবুয়ারি তিন প্রধান রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্টালিন রাশিয়ার 'ক্রিমিয়া প্রদেশের ইয়াল্টা নগরীতে' সমবেত হন। এই সম্মেলন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তিন রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ভাগ্য-নিয়ন্তা। তাঁদের সাহায্যের জন্য ইয়াল্টায় বিভিন্ন পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা যথা—মলোটোভ, ইডেন ও ষ্টেটিনাস আসেন। সামরিক বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে সমরবিশারদরা আসেন। তাছাড়া রাষ্ট্রপ্রধানদের সেনাপতিগণ ও বহু বিশেষজ্ঞ, আইনবিদ ও কূটনীতিক এই সম্মেলনে যোগ দেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার সময় ইয়াল্টার মত এত আড়ম্বরপূর্ণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ মিত্রপক্ষীয় সম্মেলন আর হয় নি। ঐতিহাসিক ফ্লেমিং (Fleming)-এর মতে ইয়াল্টা সম্মেলনে তিন রাষ্ট্রপ্রধান অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা করেন। রুজভেল্ট এই সময় স্টালিনের প্রতি আস্থা দেখান।[২] চার্চিল তাঁর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন যে, রুশ সরকার তাঁদের প্রতি অসাধারণ আতিথেয়তা ও সৌজন্য দেখান।[৩]

---

১. Flaming, P. 142.
২. From Yalta to Vietnam–David Horowitz
৩. History of Second World War–W. Churchill

ইয়াল্টার হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে তিন রাষ্ট্রপ্রধান যুদ্ধোত্তর ইওরোপে এবং যুদ্ধমান দূরপ্রাচ্য সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন— (১) যেহেতু জার্মানির পতন আসন্ন হয়, সেহেতু জার্মানি সম্পর্কে স্থির হয় যে, (ক) জার্মানির পতনের পর মিত্রশক্তি জার্মানিকে ৩টি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করে তিন শক্তির সেনাদল দ্বারা অধিকার করা হবে। এই তিন প্রধান অঞ্চল ছিল রুশ, মার্কিন ও ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল। (খ) চার্চিল ও রুজভেল্টের অনুরোধে স্টালিন রাজি হন যে, ফ্রান্সকেও জার্মানির একটি অঞ্চল দখল করতে দেওয়া হবে। কিন্তু রাশিয়া এই শর্ত আরোপ করে যে, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত অঞ্চল থেকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে ফ্রান্সকে তার অঞ্চল স্থাপন করতে দেওয়া হবে। সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চল থেকে কোন স্থান ফ্রান্সকে দেওয়া হবে না। (গ) প্রতিটি অঞ্চলে একই প্রকার আইন ও শাসন প্রবর্তনের জন্য 'কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন' স্থাপিত হবে। এতে ৪টি শক্তি যথা—ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার প্রতিনিধি থাকবে। (ঘ) জার্মানিকে নিরস্ত্রীকৃত, অ-নাৎসীকৃত, গণতান্ত্রীকৃত এবং একচেটিয়া মুনাফাভোগী কার্টেল মুক্ত করা হবে। (ঙ) সোভিয়েত নেতা স্ট্যালিন দাবী করেন যে, জার্মানিকে মিত্রশক্তির ক্ষয়ক্ষতির জন্য ২০ মিলিয়ান ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং এর অর্দ্ধাংশ রাশিয়া পাবে। চার্চিল ও রুজভেল্ট ক্ষতিপূরণ গ্রহণের সম্পর্কে নীতিগত সম্মতি দিলেও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে আপত্তি জানান।

ইয়াল্টা সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ

ইয়াল্টা সম্মেলনে পূর্ব ইওরোপ বিশেষ করে পোল্যান্ডের সমস্যা বেশি প্রাধান্য লাভ করেছিল। পোল্যান্ডের ভবিষ্যৎ মিত্রপক্ষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইয়াল্টা বৈঠকে যুদ্ধোত্তর পোল্যান্ড সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (১) জার্মানির পতনের পর 'স্বাধীন পোল্যান্ড রাষ্ট্র' গঠনের জন্য তিন প্রধান একমত হন। (২) পোল্যান্ডের পূর্ব সীমান্ত অর্থাৎ রাশিয়া ও পোল্যান্ডের সীমান্ত 'কার্জন লাইন বা রেখা' বরাবর রাখা হবে বলে স্থির হয়। এর ফলে প্রাক্-যুদ্ধকালীন পোল্যান্ডের প্রায় অর্দ্ধাংশ বা ৪৭% রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। (৩) পোল্যান্ডের পশ্চিম সীমান্ত অর্থাৎ জার্মানি ও পোল্যান্ড সীমান্ত স্টালিন 'ওডার-নীস রেখা' বরাবর দাবী করেন। কিন্তু চার্চিল ও রুজভেল্ট এতে আপত্তি জানান। শেষ পর্যন্ত এই সীমান্তের প্রশ্নটি ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবী রাখা হয়। (৪) পোল্যান্ডে কোন প্রকার সরকার স্থাপিত হবে এ সম্পর্কে তিন প্রধানের কোন নির্দিষ্ট ঐক্যমত না হলেও, একথা স্থির হয় যে, পোল্যান্ডে 'অবাধ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পোল সরকার' গঠিত হবে। সর্বসাধারণের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ব্যালট বা গোপন ভোট নেওয়া হবে। কিন্তু এই সঙ্গে স্টালিন শর্ত জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন যে, পোল্যান্ডে যে সরকার হবে তা সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি মিত্র-ভাবাপন্ন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই। অপরদিকে, চার্চিল শর্ত জোড়ার চেষ্টা করেন যে, ১৯৩৯ খ্রিঃ নাৎসী আক্রমণের সময় পোল্যান্ডের যে বৈধ

ইয়াল্টা বৈঠকে যুদ্ধোত্তর পোল্যান্ড সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

উৎঘাত করা, অস্ত্র নির্মাণ কারখানাগুলি ভেঙে ফেলা হবে। (৩) অ-কার্টেলকরণ অর্থাৎ জার্মানির দানবাকৃতি মুলধনীদের পরিচালিত বিবিধমুখী শিল্প কারখানাগুলিকে ধ্বংস করা হবে। (৪) জার্মানির পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ নীতি ঘোষণা করা হয় এবং জার্মান সামরিক বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। জার্মানিতে ভবিষ্যতে কোন সমরাস্ত্র নির্মাণ করা নিষিদ্ধ করা হয়। (৫) জার্মানির সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চল থেকে শিল্পকেন্দ্র ও যন্ত্রপাতি রাশিয়াকে তুলে নিয়ে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ নিতে সম্মতি দেওয়া হয়। (৬) পূর্ব প্রাশিয়ার একাংশ ও ডানজিগ বন্দর পোল্যাণ্ডকে এবং কোনিগসগ্রাৎস শহর রাশিয়াকে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। (৭) জার্মানিকে মিত্রপক্ষের দখলদারী সেনার অধীনে রাখার জন্য ৫টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়।[১] জার্মানির পূর্বাংশ রাশিয়ায় এবং পশ্চিমাংশ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে রাখার ব্যবস্থা হয়। প্রতি অঞ্চল সেই অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতির শাসনে থাকে। চারজন সেনাপতি একত্রে 'মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদ' গঠন করেন। (৮) বার্লিন নগর যদিও সোভিয়েত এলাকার ভিতরে ছিল, বার্লিনকে ৪ ভাগে ভাগ করে অধিকার করা হয়। (৯) যতদিন না জার্মানির সঙ্গে সন্ধি হয় ততদিন অস্থায়ীভাবে পোল-জার্মান ভৌগোলিক সীমানা ওডার-নাইসী নদী বরাবর ধার্য করা হয়। (১০) পোল্যাণ্ডকে ডানজিক, আপার ও লোয়ার সাইলেশিয়া, পূর্ব ব্র্যাণ্ডেনবার্গ, পোমিরিয়ানিয়া এবং পূর্ব প্রাশিয়ার দক্ষিণভাগ দেওয়া হয়। (১১) ফ্রান্সকে আলসাস-লোরেন দেওয়া হয়। (১২) বেলজিয়াম ইউপেন ও স্যালমেডি পায়। (১৩) সুদেতেন জেলা পুনরায় চেকোশ্লোভাকিয়াকে দেওয়া হয়। (১৪) অস্ট্রিয়াকে দখলে রাখার জন্য কয়েকটি সামরিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়। (১৫) অস্ট্রিয়াকে জার্মানি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। (১৬) নাৎসী যুদ্ধপরাধীদের বিচার ও দণ্ড-দানের ব্যবস্থা করা হয়। (১৭) পরাজিত অক্ষশক্তি ও তার মিত্র দেশগুলির সঙ্গে সন্ধির খসড়া রচনার দায়িত্ব পটসডাম সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনের ওপর অর্পণ করা হয়। (১৮) পারস্য থেকে মিত্রবাহিনী অপসারণের ব্যাপারে মতৈক্য হয়।

পটসডাম সম্মেলনে মত বিরোধ

মতানৈক্য, বাদানুবাদ ও পারস্পরিক দোষারোপের মধ্য দিয়েই পটসডাম সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। ফ্লেমিং-এর মতে, পটসডাম সম্মেলনের বাহ্যিক মতৈক্যের আড়ালে ইঙ্গ-মার্কিন জোট বনাম রাশিয়ার গভীর মতানৈক্য লুকিয়েছিল। এর ফলে পটসডাম সম্মেলন থেকেই 'পূর্ব-পশ্চিম ঠাণ্ডা লড়াই' প্রকাশ্যে এসে পড়ে। পরবর্তী পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে শান্তিচুক্তি রচনার ক্ষেত্রে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। জার্মানি এই মতবিরোধের প্রধান ক্ষেত্র ছিল।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী শান্তিচুক্তিগুলি (The Foreign Ministers' Conference and the Peace Treatics after

---

১. Contemporary Europe Since 1870–Carlton Hays

এমতাবস্থায় ইয়াল্টা বৈঠকে রুজভেল্ট অনুরোধ করেন যে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়াকেও যোগ দিতে হবে। স্টালিন এক্ষেত্রে প্রথমে রাশিয়ার যোগ দেওয়ার ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করে কারণ দেখান যে রাশিয়া রণক্লান্ত, রুশ জনমত আর যুদ্ধ চায় না। শেষ পর্যন্ত তিনি বলেন যে, যদি তাঁর কয়েকটি শর্ত পূরণ করা হয় তবে তিনি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিবেন। রুজভেল্ট স্ট্যালিনের এই গোপন শর্তগুলি স্বীকার করেন। শর্তগুলিতে বলা হয় যে—(১) বর্হি-মঙ্গোলিয়ায় স্থিতাবস্থা (অর্থাৎ রাশিয়ার প্রাধান্য) স্বীকৃত হবে। (২) কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে রাশিয়ার আধিপত্য স্বীকার করা হবে। (৩) শাখালিন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ ভাগ রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে হবে। (৪) মাঞ্চুরিয়ায় রুশ সেনার অবস্থান স্বীকৃতি পাবে। (৫) দক্ষিণ মাঞ্চুরিয় রেলপথ, পোর্ট আর্থার, ডাইরেন বন্দর দ্বয় রুশ-চিন দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে থাকবে। (৬) মাঞ্চুরিয়ার ওপর চিনের আধিপত্য রাশিয়া স্বীকার করবে। এই শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়া দূরপ্রাচ্যে জাপানের বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশে রাজী হয়।

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার স্টালিনের শর্তাবলী

ইয়াল্টা বৈঠকে জাতিপুঞ্জ বা U.N.O. গঠন সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন-রুশ মত বিনিময় হয়। স্টালিন জাতিপুঞ্জে সোভিয়েত রাশিয়ার যোগদান সম্পর্কে শর্ত আরোপ করেন যে, জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া বাইলো রাশিয়া ও ইউক্রেনের স্বতন্ত্র আসন ও ভোটাধিকার থাকবে। মার্শাল স্টালিন এই দাবীর দ্বারা সোভিয়েত স্বার্থ এবং জাতিপুঞ্জে সোভিয়েত গরিষ্ঠতা রক্ষার চেষ্টা করেন। রুজভেল্ট ও চার্চিল এই দাবী স্বীকার করেন।

জাতিপুঞ্জের গঠন সম্পর্কে রাশিয়ার দাবী

এইভাবে ইয়াল্টা বৈঠকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ব সম্পর্কে তিন প্রধান কিছু কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেন। ইয়াল্টা সম্মেলন থেকে ফিরবার পর রুজভেল্ট ঘোষণা করেন যে—"ক্রিমিয়ার সম্মেলন থেকে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এসেছি যে, শান্তি স্থাপনের পথে আমরা শুভযাত্রা আরম্ভ করেছি"। চার্চিলও তাঁর মার্কিন সহযোগীর মতের প্রতিধ্বনি করে হাউস অফ কমন্সে বলেন যে—"আমি বিশ্বাস করি, এই পার্লামেন্ট একথা অনুভব করবে যে, যে বন্ধন তিন শক্তিকে গ্রথিত করেছে এবং তাদের পারস্পরিক আস্থা সৃষ্টি করেছে তা আরও দৃঢ় হবে"।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের মৃত্যুর পর ইয়াল্টা সম্মেলনের নেতাদের মধ্যে আস্থার অভাব

কিছুদিনের মধ্যে ইয়াল্টার উচ্চাশা ও আদর্শবাদ লুপ্ত হয় এবং পূর্ব ও পশ্চিমী শক্তিগুলির মধ্যে নগ্ন ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও ঠাণ্ডা লড়াই যুদ্ধকালীন মিত্রতার পরিবেশকে কলুষিত করে। ইয়াল্টার অব্যবহিত পরেই রুজভেল্টের অকস্মাৎ মৃত্যু হয় (এপ্রিল, ১৯৪৫ খ্রিঃ)। উপরাষ্ট্রপতি হ্যারী ট্রুম্যান মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদে বসেন। এদিকে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনে চার্চিল ও তাঁর দল পরাস্ত হয়। শ্রমিক দলের জয়লাভের লে এই দলের নেতা ক্লেমেন্ট এটলী ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হন। এই দুই নেতা ছিলেন

powers was not an episode like other wars of modern times. The term 'Cold war' was invented to describe a state of affairs. The principal ingredient in this state of affairs was the mutual hostility and fears of the protagonists. These emotions were rooted in their several historical and political differences and were powerfully stimulated by myths which at times turned hostility into hatred. The Cold war dominated World affairs for a generation and more।"[১] লিটার কালভোকোরেসিও এই ঠান্ডা লড়াইকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুটি মহাশক্তিধর দেশের মধ্যেকার সংঘাত বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও তিনি মনে করেন এই সংঘাত আধুনিককালে আর পাঁচটা যুদ্ধের মতো ছিল না। অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তী ঠান্ডা লড়াই-এর সংজ্ঞা নিয়ে লিখেছেন "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তি থেকে বর্তমান শতকের শেষ দশক পর্যন্ত যে কেন্দ্রীয় উপদ্রব বিশ্ব রাজনীতিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল এক কথায় 'ঠান্ডা লড়াই' নামে তাকে চিহ্নিত করা হয়। এ হল এক চূড়ান্ত উত্তেজনাময় পরিস্থিতি, যা মহাশক্তিধর দুই বিপরীতধর্মী রাষ্ট্রব্যবস্থা—পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী-এর মধ্যে যুগপৎ ক্ষমতা ও আদর্শের সংঘাতকে বিপজ্জনক সীমায় নিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছিল। যুদ্ধ অথচ যুদ্ধ নয়—এ ধরনের সংঘাত এর আগে মানুষের ইতিহাসে দেখা যায় নি।"[২] অধ্যাপক অসিত কুমার সেনের মতে, পরস্পর-বিরোধী সোভিয়েত ও মার্কিন গোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকেই ঠান্ডা লড়াই বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর একদিকে ছিল মুক্ত দুনিয়া, অন্যদিকে মার্কসীয় দুনিয়া। এক পক্ষ ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্রের পথে পৃথিবীতে সুখ, শান্তি আসবে বলে দাবি করত; অন্য পক্ষ সাম্যবাদের পথে পৃথিবীকে সমৃদ্ধশালী করবার পক্ষপাতি। উভয়ের বিরোধ ঠান্ডা লড়াইয়ের সৃষ্টি করেছিল। ঠান্ডা লড়াই-এর মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন—দু-পক্ষই বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেছিল। কারণ তাহলে নিজেদের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রতিপন্ন করা যাবে। ঠান্ডা লড়াই প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতার লড়াই। সাধারণভাবে ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়কাল থেকে ১৯৯০-এর দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ঠান্ডা লড়াইয়ের সময়কাল বলে ধরা হয়।

ঠান্ডা লড়াই-এর কারণ—বিভিন্ন মতামত (Causes of the Cold War : different views) : ঠান্ডা লড়াই-এর কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মতামত উপস্থাপন করেছেন। এই বিষয়ে প্রধানত তিনটি মতামত লক্ষণীয়—(১) রক্ষণশীল বা ঐতিহ্যগত মতামত (Orthodox বা Traditional view), (২) সংশোধনবাদী মতামত (Revisionist view) এবং (৩) বাস্তবধর্মী মতামত (Objective বা realistic view)।

---

১. World Politics 1945–2000–Peber Calvocaressi, P. 3

২. সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—রাধারমণ চক্রবর্তী, পৃ. ১৩।

ঠান্ডা লড়াই-এর কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত: রক্ষণশীল বা ঐতিহ্যগত মতামত

রক্ষণশীল বা ঐতিহ্যগত মতামত (**Orthodox or Traditional view**) **:** এই মতাবাদে, ঠান্ডা লড়াই প্রধানত 'কমিউনিজম এবং ধনতন্ত্রবাদের 'আদর্শের দ্বন্দ্ব' বলে মনে করা হয়। ঐতিহ্যবাদী ভাষ্যকারদের মতে, ঠান্ডা লড়াই-এর জন্য কট্টরপন্থী সোভিয়েত নেতারাই দায়ী ছিলেন। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে নাৎসীদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, পূর্ব জার্মানি প্রভৃতি দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে দেয় নি। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিতে বলপ্রয়োগ করে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থা কায়েম করে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুনভাবে অস্থিরতা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। পূর্ব ইওরোপের ব্যাপারে স্টালিন পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সঙ্গে কোনরকম আপোষ করতে রাজি হন নি। এই ঐতিহাসিকদের মতে, পূর্ব ইওরোপের ব্যাপারে স্ট্যালিন যে ধরনের অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেন, তার ফলে পশ্চিমি মিত্র শক্তিগুলির মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে সন্দেহ, ভীতি ও আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। কমিউনিস্ট রাশিয়ার সম্প্রসারণবাদী ও আগ্রাসী ভাবভঙ্গি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমি শক্তিগুলির গভীর চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধোত্তর সম্মেলনগুলিতে পূর্ব ইওরোপের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও পশ্চিমি শক্তিবর্গের অভিযোগ ছিল যে স্টালিন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলতে সোভিয়েত ইউনিয়নের রীতি ও শর্তসাপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বুঝিয়ে ছিলেন, যা অনেক ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কিন্তু এই ব্যাপারে স্টালিন যে ধরনের অনমনীয়তার দৃষ্টান্ত রাখেন, তার ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়ার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায় এবং Cold War অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। গ্রিস ও তুরস্ক দেশদুটিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট গেরিলাদের সাহায্য করে চলেছিল।

ঠান্ডা লড়াই সম্পর্কে মার্কিনি ভাষ্য

অবশ্য মনে রাখা উচিত যে, রক্ষণশীল বা ঐতিহ্যগত ব্যাখ্যা ছিল প্রধানত মার্কিনি ভাষ্য বা American View যা মার্কিন প্রশাসন তথা কূটনীতিবিদরাই হাজির করেছিলেন। আমেরিকার রাজনীতিবিদরাও এই ব্যাখ্যা সমর্থন করেছিলেন। এঁদের মতে "Cold War was a brave and essential response of free men to Communist aggression"। উইনস্টন চার্চিল এর "The Second World War', হার্বার্ট ফিস্-এর "Churchil, Roosevelt and Stalin" ও "From Trust to Terror : The onset of the Cold War" প্রভৃতি গ্রন্থে এবং জর্জ কেন্নানের "American diplomacy" গ্রন্থে সাভিয়েত রাশিয়ার বিস্তার নীতিকে Cold War-এর উন্মেষের জন্য দায়ী করা হয়েছে। ই সমস্ত লেখক তাঁদের রচনায় Cold War-এ সোভিয়েত দায়িত্বের কথা বিশেষ করে াভিয়েত সম্প্রসারণবাদের কথা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এঁরা মনে করেন যে, জিবাদী ব্যবস্থার ওপর আঘাত হানতে এবং সাথে সাথে কমিউনিস্ট জগতের পরিধি

বঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিবাদে আলবেনিয়া ওয়ারশ চুক্তির প্রতি দায়বদ্ধতা অস্বীকার করে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ওয়ারশ চুক্তি সংগঠনের কাজে সে অংশ গ্রহণ করে নি এবং ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে আলবেনিয়া ওয়ারশ চুক্তি সংগঠন ত্যাগ করেছিল। ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলির সামগ্রিক পররাষ্ট্র নীতির বিরুদ্ধে রোমানিয়া স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করে চলে। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে রোমানিয়া প্রস্তাব দেয় যে, ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত সামরিক বাহিনীর সেনাধ্যক্ষের পদ কেবলমাত্র সোভিয়েত রাশিয়ার সেনাপতিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পর্যায়ক্রমে অন্য সদস্য দেশগুলিকেও সুযোগ দেওয়া উচিত। পূর্ব ইওরোপে সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখার প্রয়োজন নেই বলেও রোমানিয়া মত প্রকাশ করে। রোমানিয়া বলে যে, সোভিয়েত নিউক্লিয়ার অস্ত্রসম্ভারের ওপর ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া উচিত। চেকোশ্লাভাকিয়া, রোমানিয়া ও পোল্যাণ্ড বিভিন্ন সময়ে নিজ নিজ দেশ থেকে সোভিয়েত সৈন্য অপসারণেরও যুক্তি দেখায়।

ঠান্ডা লড়াই-এর যুগে দুপক্ষই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়িয়ে চলে

ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলাকালে দুপক্ষ প্রত্যক্ষ সংঘাত সর্বদাই এড়িয়ে গেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ার ও মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেস একদা সমগ্র পূর্ব ইওরোপ থেকে সাম্যবাদকে গুটিয়ে দেওয়ার (Roll back) আস্ফালন করেছিলেন। শুধুই সীমাবদ্ধকরণ (Containment)-এর চেয়ে সোভিয়েত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'বিপুল প্রতিশোধ গ্রহণ' (massive retaliation)-এর পথ অবলম্বনের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ সংঘাতের পথ শেষ পর্যন্ত বদল করা হয়েছে। আসলে কোন পক্ষই নিজের অস্তিত্বের স্বার্থে অপর পক্ষের ভীষন ক্ষতি করতে চায় নি। জন গ্যাডিস-এর মতে, যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত রাশিয়া, কেউই একে অপরকে ধ্বংস করতে চায় নি, তাই ঠাণ্ডা লড়াই-এর ইতিবাচক দিক, দ্বন্দ্বের মধ্যেও শান্তির দিকও একটা ছিল। অধ্যাপক গ্যাডিস ঠাণ্ডা লড়াইকে বলেছেন "Long Peace"। তবে ঠাণ্ডা যুদ্ধ প্রত্যক্ষ বারুদের যুদ্ধ না হলেও লড়াই-এর আয়োজন কোন দিক থেকে কম ছিল না। অধ্যাপক অলক কুমার ঘোষ লিখেছেন—"হবস্ যে লেভিয়াথানে বলেছিলেন, যুদ্ধ শুধু আঘাত-প্রত্যাঘাতেই হয়, তা নয়, আঘাতের ইচ্ছা ও প্রস্তুতিও যুদ্ধের অঙ্গ, ঠাণ্ডা লড়াই-এ সেই লক্ষণ স্পষ্ট ছিল। একদিকে ট্রুম্যান ডক্ট্রিন, মার্শাল প্লান আর NATO, অন্যদিকে কমিনফর্ম, কমেকন আর ওয়ারশ প্যাক্ট—এই দুই ক্রিয়া-প্রক্রিয়াই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বোযুদ্ধোত্তর যুদ্ধের মূল কথা।"[1]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানি, দ্বিধা-বিভক্ত জার্মানি এবং বার্লিন অবরোধ (Germany after the Second World War, Divided Germany and the Berlin Blockade) ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানিকে কেন্দ্র করে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পশ্চিমী জোট ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

১. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব—অলককুমার ঘোষ পৃ. ১৬০

চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। এই চুক্তির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি, উদারপন্থী মানসিকতা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত রাশিয়া ইওরোপের সেই সমস্ত এলাকা থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করতে শুরু করে যেগুলি একদা সোভিয়েত বাহিনী নাৎসী অধিপত্য থেকে মুক্ত করেছিল। সোভিয়েত রাশিয়া অবশ্য এটা বুঝেছিল যে, পূর্ব ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ওপর এই জাতীয় উদারীকরণের নীতির ফলাফল ক্ষতিকারকও হতে পারে। এই কারণে অস্ট্রিয়াকে ছাড় দেওয়ার আগে সোভিয়েত রাশিয়া পূর্ব ইওরোপকে নতুন দায়িত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল। ওয়ারশ চুক্তি স্বাক্ষরের এটাও ছিল অন্যতম কারণ।

এই জোটের লক্ষ্য ছিল পূর্ব ইওরোপে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও অনুপ্রবেশ প্রতিহত করা, সংশোধনাবাদ এবং পুঁজিবাদের প্রসারের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধ গড়ে তোলা। পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সামরিক জোট—উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংগঠন ও তার আগ্রাসী নীতির মোকাবিলা করা এবং সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের যৌথ প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই ছিল ওয়ারশ চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য। (The Warsaw Pact, is in its essentials, is a carbon copy of the NATO)। যদিও কাগজে—কলমে এটা ছিল আঞ্চলিক আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা, তবু NATO-র বিরুদ্ধে পাল্টা জোট হিসাবেই এটা গড়া হয়েছিল। অর্থাৎ এটা ছিল স্পষ্টতই ন্যাটোর সামরিক উত্তর-পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে ন্যাটোর বিরোধিতা করাই ছিল এই চুক্তির উদ্দেশ্য। অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তী লিখেছেন—"নতুন সদস্য গ্রহণের বিধান এতে থাকলেও সদস্যপদ গ্রহণের পর এ ধরনের অন্য কোন সংগঠনের যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এই চুক্তির বলে চুক্তিবদ্ধ দেশগুলিতে সংকটকালে রুশ সেনাবাহিনীর অবাধ প্রবেশ স্বীকৃত হয়। এইভাবে যে-কোন মুহূর্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দুই মহাজোট ইওরোপে ঠাণ্ডা লড়াইকে সামরিক দিক থেকে এক বিপদজনক স্তরে নিয়ে যায়। এর ফলে অবশ্য যে ভারসাম্য রচিত হয়, তাকে বিঘ্নিত করার সক্রিয় কোন ঝুঁকি কোন পক্ষেই কখনোই নেওয়ার চেষ্টা করে নি। যদিও মাঝে মাঝে হুমকি দেওয়া বন্ধ থাকে নি।"[১] এই চুক্তি আসলে ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে একটি সামরিক জোট। সোভিয়েত সেনাপ্রধান মার্শাল কনিয়েভ এই সামরিক জোটের অধিকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। মিত্ররাষ্ট্রগুলির মধ্য থেকে তার সহকারী নিয়োগ করা হবে বলে স্থির হয়। মস্কোতে এর সদর দপ্তর স্থাপিত হয়েছিল। প্রতিরক্ষা প্রয়োজনে এবং সৈন্য সংগঠনের প্রশ্ন বিবেচনার জন্য একটি রাজনৈতিক ও পরামর্শদাতা সমিতি গঠন করা হয়েছিল। এই সমিতিতে সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নেওয়া হয়েছিল।

ওয়ারশ চুক্তির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ঠাণ্ডা লড়াই-এর ফলে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র পরস্পর-বিরোধী সামরিক-কূটনৈতিক জোটে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমী রাষ্ট্ররা ন্যাটো ও সিয়াটো গঠন করে কমিউনিজমের প্রসার রুদ্ধ করার

১. সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক— রাধারমণ চক্রবর্তী, সুকল্পা চক্রবর্তী, পৃ. ১৯৬

অজুহাতে সোভিয়েত রাশিয়া ও তার মিত্ররাষ্ট্রদের সীমানার চতুর্দিকে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করেছিল। এই অবস্থায় সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলি ওয়ারশ চুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ক্রুশ্চেভের এই সংস্থা গঠন ছিল খুবই জরুরী। চুক্তিভুক্ত দেশগুলির সম্পর্ক সমতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের নীতি দ্বারা পরিচালিত বলে দাবী করা হয়। কোন সদস্য রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের স্বার্থের বিনিময়ে একতরফা লাভ বা সুবিধা ভোগ করতে পারবে না বলেও চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়।

ওয়ারশ চুক্তির গুরুত্ব

সদস্য দেশগুলির পূর্ণ সমমর্যাদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ওয়ারশ চুক্তি সংগঠন সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব দ্বারা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক পরিচালিত করবে বলে ঘোষণা করা হয়। ওয়ারশ চুক্তি সংস্থা রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদের ধারা লংঘন করার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয় নি। কারণ রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ আগ্রাসনের ঘটনায় হস্তক্ষেপ করলেই ওয়ারশ চুক্তি সংস্থার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। এই চুক্তি দ্বারা স্থির হয় যে—(১) এই সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগণ ভবিষ্যতে আক্রমণাত্মক ঘটনার বিরুদ্ধে যৌথভাবে বাধা দান করবে। (২) এই চুক্তির সদস্য রাষ্ট্রগণ এই সংস্থার উদ্দেশ্য-বিরোধী কোন চুক্তি বা সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হবে না। (৩) আর্থিক ক্ষেত্রেও এই সংস্থার সদস্যবৃন্দ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। এই চুক্তির সপ্তম ধারায় বলা হয়েছিল স্বাক্ষরকারী কোন রাষ্ট্র এই ধরনের অন্য কোন চুক্তিতে যোগদান করতে পারবে না। এই ধারা স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমত্বের পক্ষে ক্ষতিকারক ছিল। তাছাড়া এই ধরনের শর্তের মাধ্যমে এটাই সুনিশ্চিত করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল যে, এই সমস্ত সদস্য দেশগুলি সোভিয়েত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ আধিপত্যের মধ্যে হবে। ওয়ারশ চুক্তির মধ্য দিয়ে একটা বিষয় পরিস্কার হয় যে, স্টালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত রাশিয়া পুনরায় পূর্ব ইওরোপিয় রাষ্ট্রগুলিকে সোভিয়েত রাশিয়ার আওতাভুক্ত করে তুলতে সচেষ্ট হয় এবং ওয়ারশ চুক্তির মধ্য দিয়ে সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এই চুক্তির সংগঠকরা রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিল। ১৯৯১ খ্রিঃ ৩৬ বছর পরে এই চুক্তির অবসান হয়।

ওয়ারশ চুক্তি জোটের শর্ত অনুসারে রাশিয়া পূর্ব ইওরোপে তার সেনাদল রাখার অধিকার পায়। ওয়ারশ চুক্তি পূর্ব ইওরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সোভিয়েত প্রাধান্য কমিউনিস্ট নেতাদের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে হাঙ্গেরিতে বিদ্রোহ আরম্ভ হলে এই ওয়ারশ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সোভিয়েত বাহিনী তাকে দমন করেছিল। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে চেক কমিউনিস্ট নেতা আলেকজাণ্ডার ডুবচেক কিছু কিছু সংস্কারে উদ্দোগী হলে ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত প্রায় এক লক্ষ সৈন্য চেকোশ্লোভাকিয়ায় পাঠানো হয় এবং ডুবচেক অপসারিত হয়েছিলেন। আলবেনিয়া অভিযোগ করেছিল যে, সোভিয়েত প্রাধান্য শরিকদের সার্বভৌমত্ব সীমিত করেছে এবং এর ফলে মিত্ররাষ্ট্রগুলির স্বকীয়তা নষ্ট হচ্ছে, স্বাধীনতা থেকে তারা

ওয়ারশ চুক্তিতে রাশিয়ার প্রাধান্য পূর্ব ইওরোপীয় দেশ গুলিতে বিক্ষোভ দেখা দেয়

নীতি নির্ধারণ এবং সামরিক ও আর্থিক সহায়তার দিক দিয়ে আমেরিকার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল। তাই কাগজে-কলমে যৌথ সামরিক ব্যবস্থা বলা হলেও ন্যাটো ছিল মার্কিন-কেন্দ্রিক। অন্যান্য সদস্য দেশগুলি মার্কিন প্রাধান্যকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। আবার অনেকে বলেছেন যে, এই চুক্তি U. N. O-র মর্যাদাহানি করেছিল।

ন্যাটো জোট গঠিত হলে ঠাণ্ডা লড়াই চরম সীমায় ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা বেলজিয়াম এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ন্যাটো একটি 'প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা'. কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া মনে করে যে, ন্যাটো জোটের দ্বারা এবং আণবিক অস্ত্রের সাহায্যে তাকে আক্রমণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বুশ নেতারা ন্যাটোকে 'আগ্রাসী সামরিক সংঘ' হিসাবেই দেখেছিলেন এবং ন্যাটোর বিরুদ্ধে বিস্তর আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করেন। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী গ্রোমিকো বলেছিলেন, "The United States and Great Britain are building up a series of military bases which can only be justified as the bases of aggression." ন্যাটো জোট অবশ্য ঘোষণা করে যে, ন্যাটো সদস্যরা আঞ্চলিক নিরাপত্তার কারণে জোট গঠন করলেও U. N. O. নীতি ও আদর্শের অনুগামী থাকবেন। কিন্তু ইওরোপ দুটি শিবিরে ভাগ হওয়ার দরুণ U. N. O. কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐক্যমতে আসতে পারে নি। ন্যাটো গোষ্ঠী U. N Assembly-তে গড়ে ৪০টি এবং U. N. Security Council-এ গড়ে ৬টি ভোটের অধিকারী হওয়ায়, সোভিয়েত প্রতিনিধি তীব্র বক্তৃতার পর ভেটো প্রদান করে বৃহত্তর সদস্যের সিদ্ধান্তকে বানচাল করতে থাকেন। বিশেষভাবে জার্মানিকে ন্যাটো-র অন্তর্ভুক্ত করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ন্যাটো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনা বাড়িয়েছিল। "The critics of the NATO point out that as a result of the NATO, the rivalry between the United States and the Soviet Union increased and international tension became more and more acute. There was always the possibility of a war as the NATO powers were determined to stop Soviet expansion at all places in the Atlantic area."

ন্যাটো গঠনের পর ঠাণ্ডা লড়াই চরম সীমায় উপনীত

আমেরিকার নেতৃত্বাধীন অন্যান্য মিত্র জোট (U.S.A.-led other alliances): সোভিয়েত আগ্রাসন প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে আমেরিকা আরও কয়েকটি জোট গড়ে তুলেছিল। ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা South East Asian Treaty Organisation (SEATO) গড়ে তুলেছিল। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে গড়ে তুলেছিল Middle East Defence Organisation (MEDO)। MEDO চুক্তিটি বাগদাদে স্বাক্ষরিত হয় এবং বাগদাদ এই সংস্থার সদর দপ্তর হয়। তাই এই চুক্তি 'বাগদাদ চুক্তি' নামেও পরিচিত। পরবর্তীকালে এই চুক্তির নাম হয় Central Treaty Organisation

State) গঠন করেছিল। এই পর্বে অস্বাভাবিক সাম্যবাদ ভীতি তার পূর্ণ সামরিকীকরণ ঘটিয়েছিল বলা চলে। এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন প্রতিরক্ষা আইন বলবৎ করেছিল এবং একটি অত্যন্ত শক্তিশালী গোয়েন্দা বিভাগ "Central Intelligence Agency" বা CIA গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরমাণু বোমা আবিস্কার করার এবং মাও-এর নেতৃত্বে চিনে কমিউনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মার্কিন নীতি-নির্ধারকগণ বেষ্টনী নীতি (Policy of Containment) কে আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে প্রচার চালান। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ ৬৮ তম প্রস্তাব বা NSC–68 গ্রহণ করেছিল। তার ফলে মার্কিন নীতির মৌলিক রূপান্তর ঘটেছিল। এটি Truman Doctrine-এর মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই প্রস্তাবটির পরিধি ছিল বিশ্বজনীন। রিচার্ড ক্রুকেট-এর ভাষায়, "NS–68 was explicitly global in scope and military in application"।[১]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ

ওয়ারশ চুক্তি, ১৯৫৫ খ্রিঃ (Warsaw Pact) ঃ ঠাণ্ডা লড়াই চলাকালীন সময়ে সামরিক জোট গঠনের মাধ্যমে পশ্চিমী রাষ্ট্র জোটের শক্তি বৃদ্ধির প্রত্যুত্তরে সোভিয়েত রাশিয়া ও তার মিত্ররাষ্ট্রগুলির 'সমাজতান্ত্রিক সামরিক জোট' গঠন করে। রাশিয়া ইতিমধ্যেই পরমাণু বোমা আবিষ্কার করে এবং মহাকাশে যুরি গ্যাগরিন মহাকাশ যান দ্বারা চন্দ্র পরিক্রমা দ্বারা তার শক্তির পরিচয় দেয়। তবু NATO চুক্তির বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য স্থাপনের জন্য রাশিয়া পূর্ব ইওরোপের তার তাঁবেদার দেশগুলি নিয়ে Warsaw Pact নামে এক চুক্তি জোট গঠন করে। ওয়ারশ চুক্তি গঠনের আর একটি কারণ হল, বিশেষত পশ্চিম জার্মানিকে ন্যাটো জোটের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে পশ্চিম ইওরোপীয় সুরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে সংহতির সম্ভাবনা গড়ে উঠেছিল, তা সোভিয়েত ইউনিয়নকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এই জাতীয় উদ্বেগ ও আশঙ্কার দরুন ওয়ারশ চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে সোভিয়েত রাশিয়া বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। পূর্ব ইওরোপের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাশিয়া ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই মে পোল্যাণ্ডের ওয়ারশ শহরে পূর্ব ইওরোপের মিত্ররাষ্ট্রদের একটি সম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলনে 'ওয়ারশ চুক্তি" স্বাক্ষরিত হয়। সোভিয়েত রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি ও আলবেনিয়া যৌথ নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার বিষয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষর করে। পরে পূর্ব জার্মানিও এই জোটে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু মাও-এর চিন এই জোটে সামিল হয় নি। ন্যাটো জোটে পশ্চিম জার্মানির অন্তর্ভুক্তি (১৯৫৫ খ্রিঃ) সোভিয়েত রাশিয়ার দিক থেকে বিপদজনক মনে হওয়ায় তার উদ্বেগ বৃদ্ধি ছাড়াও ওয়ারশ চুক্তি গঠনের পিছনে আর এক ধরনের কারণ ছিল। ১৯৫৫ খ্রিঃ ৫ মে সোভিয়েত রাশিয়া অস্ট্রিয়ার সঙ্গে একটি শান্তি

ন্যাটোর প্রত্যুত্তরে সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন ওয়ারশ চুক্তি গঠন

---

১. The Fifty Years War–Richard Crocket. P. 82–83

পশ্চিম জার্মানির পুনরস্ত্রিকরণ ঘটানো হয় এবং ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তাকে ন্যাটোর সদস্যরূপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাইতে মার্কিন সেনেট এই চুক্তি ৮২—১৩ ভোটে অনুমোদন করে। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার দীর্ঘ ঐতিহ্যসম্পন্ন 'মনরো নীতিকে' বিসর্জন দিয়ে শান্তিকালীন সময়ে এই প্রথম আমেরিকা মহাদেশের ভৌগোলিক পরিধির বাইরে সামরিক জোটের শরিক হয়েছিল। NATO-কে প্রথমে অস্ত্রসজ্জার ব্যয় নির্বাহের জন্য আমেরিকা ১ বিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য দেয়।

ন্যাটোর অস্ত্রসজ্জা

NATO-র হাতে ছিল মোট ২৫ ডিভিসন পদাতিক সেনা। সুতরাং, ন্যাটোভুক্ত দেশগুলিকে আত্মরক্ষা ও শক্তিসাম্যের জন্য আণবিক বোমার ওপরেই বা ক্ষেপণাস্ত্রের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স আণবিক বোমা নির্মাণ করে।

ন্যাটো চুক্তিতে যোগদানের ফলে মার্কিন দেশ তার চিরাচরিত Isolation বা 'একলা চলো' নীতি ত্যাগ করে। আমেরিকা বহু বিচার–বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেয়। যাঁরা মনে করেন যে, Containment নীতিকে কার্যকরী করার জন্যই আমেরিকা ন্যাটো চুক্তিতে যোগ দেয় তারা আংশিকভাবে ঠিক কথা বলেন। আসলে দূরপাল্লার বোমারু বিমানের আবিষ্কার, আণবিক বোমা বহনকারী দূরপাল্লার বোমারু বিমান, দূরপাল্লার আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের আবিষ্কার, রাশিয়ার হাতে হাইড্রোজেন বোমার অস্তিত্ব এবং মহাকাশে রুশ স্পুটনিকের জয়যাত্রা আমেরিকাকে কম্পিত করে। দুই মহাসমুদ্রের ভৌগোলিক আত্মরক্ষার বলয় আর মার্কিন দেশকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম নয়, একথা আমেরিকা বুঝে ফেলে। সুতরাং ন্যাটো চুক্তিতে যোগ দিয়ে আমেরিকা শুধু পশ্চিম ইওরোপকে সম্ভাব্য কমিউনিস্ট আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে প্রয়াস করে নি, তার নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে তাকে ন্যাটোতে যোগ দিতে হয়।

আমেরিকা তার নিজের স্বার্থে ন্যাটোতে যোগ দেয়

ন্যাটোর সমালোচনা করে অনেকেই বলেছেন যে, এই সংস্থাটি আটলান্টিক মহাসাগরের উভয় তীরের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, ইতালি, গ্রিস ও তুরস্ককে এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল; যদিও এই রাষ্ট্রগুলির কেউই ভৌগোলিক অর্থে আটালান্টিক রাষ্ট্রের পর্যায়ভুক্ত নয়। অথচ আটলান্টিক তীরে অবস্থিত স্পেনকে ন্যাটোর মধ্যে আনা হয় নি। আসলে সোভিয়েত রাশিয়াকে প্রতিরোধ করাই ছিল ন্যাটোর আসল লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত, ন্যাটোর সদস্যদের মধ্যে কোন রকম ঐক্য বা সংহতি ছিল না। ইতালি ও জার্মানি এই দুটি দেশের বিরুদ্ধে অন্যান্য সদস্য দেশগুলি জীবনমরণ সংগ্রাম করেছিল। তারা শুধুমাত্র সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধিতার জন্যই ন্যাটোতে যোগ দেয়। তাই অধ্যাপক William R. Kellar বলেছেন— "The Atlantic alliance was forged not by a common devotion to shared beliefs but rather by the sentiments of danger।" আসলে আমেরিকার স্বার্থে এই চুক্তি হয়েছিল। ন্যাটো

ন্যাটোর চুক্তির সমালোচনা

রাশিয়া গ্রাস করবে। চার্চিল আরো বলেন যে, রাশিয়া এখন কেবলমাত্র ইওরোপ নয়, এশিয়া, আফ্রিকার সদ্য-স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশগুলিকেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মুখোসে নিজের তাঁবেদার করতে চলেছে। একটি প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় পক্ষীর মত সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন ইওরোপীয় সভ্যতা গ্রাস করতে উদ্যত। গণতান্ত্রিক জগৎ বা Free World-কে রক্ষা করার দায়িত্ব এখন মার্কিন দেশের।

চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতা মার্কিন শাসক মহলে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই বক্তৃতাকে সহজে মেনে নিতে পারে নি এবং সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। স্টালিন সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন জোট কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর বলপ্রয়োগ পরামর্শদানের জন্য চার্চিলকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, চার্চিলের এই বক্তৃতাকে যুদ্ধবাজরা লুফে নিতে দ্বিধা করে নি। ফ্লেমিং তাঁর 'The Origins of the Cold War' গ্রন্থে Cold War-এর জন্য এই ফুলটন বক্তৃতা দায়ী ছিল বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি ঐ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যদি কখনও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, তাহলে চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতা তার উৎপত্তির প্রধান দলিল হবে। বলা যেতে পারে যে চার্চিলের 'ফুলটন বক্তৃতাকে' কেন্দ্র করে ঠাণ্ডা যুদ্ধের এক প্রকার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল।

বেষ্টনী নীতি (Policy of Containment) ঃ প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের জঙ্গি সোভিয়েত বিরোধিতার ঠিক বিপরীতে ছিলেন মার্কিন বাণিজ্য সচিব হেনারি ওয়েলস। ওয়েলস বলেন যে, চার্চিলের জঙ্গিপনা সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘোর বৈরীতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। ওয়েলস মনে করেন পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধি পাশ্চাত্য মহলের কাছে অন্যায় মনে হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেও জাপান ও পশ্চিম জার্মানিতে অধিকৃত অঞ্চলে একইভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হয়েছিল। তিনি বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যত বেশি অনমনীয় হবে, তার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ সোভিয়েত রাশিয়াও তত বেশি অনমনীয় হয়ে উঠবে। তাই পরিস্থিতি বিবেচনা করে ওয়েলস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'সহাবস্থানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি' গ্রহণ করার উপদেশ দেন। চার্চিল বক্তৃতার পর মার্কিন শাসক শ্রেণির একটি বড় অংশ দাবী করেন যে, আমেরিকার এখন কর্তব্য হল সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চল থেকে ইওরোপকে মুক্ত করা। সিনেটর ভ্যাণ্ডেনবার্গ এই মর্মে এক প্রস্তাব সিনেট সভায় উত্থাপন করেন। মার্কিন পেন্টাগন একই নীতি চালাচ্ছিল। সুতরাং প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের ওপর Liberation বা সোভিয়েত অঞ্চল থেকে ইওরোপকে মুক্ত করার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে চাপ আসে।

মার্কিন বিদেশ সচিব হেনরি ওয়েলেসের সহাবস্থানমূলক নীতি

এই সময় ১৯৪৭ খ্রিঃ ৪ঠা জুলাই Foreign Affairs (চতুর্থ সংখ্যা) পত্রিকায় "Mr X" ছদ্মনামে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির লেখক ছিলেন রাশিয়ায় ভূতপূর্ব সহকারী মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ এফ কেন্নান (George F. Kennan)। জর্জ কেন্নান ছিলেন

দেশকে যুক্ত করাতে পশ্চিমী আত্মরক্ষাব্যূহ আরো জোরদার হবে বলে মনে করা হয়। যদিও আমেরিকা ইওরোপের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সংশয় ছিল। সোভিয়েত রাশিয়া বার্লিন অবরোধ করলে আমেরিকার নিরাপত্তার প্রশ্নটি বড়ো হয়ে দেখা দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ জুন মার্কিন সেনেটে রিপাবলিকানভুক্ত দলের নেতা আর্থার ভাণ্ডেনবার্গ (Arthur Vandenberg) একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাব 'ভ্যাণ্ডেনবার্গ প্রস্তাব (Vandenberg Resolution) নামে খ্যাত। এই প্রস্তাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আমেরিকার বাইরে অবস্থিত দেশগুলির সঙ্গে যৌথ সামরিক চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার দেওয়া হয়। ভ্যাণ্ডেনবার্গ মার্কিন সেনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ভ্যাণ্ডেনবার্গ প্রস্তাবটি মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটায়। এতদিন পর্যন্ত মার্কিন সরকার 'মনরো নীতি' অনুসারে কেবলমাত্র পশ্চিম গোলার্ধে অবস্থিত দুটি আমেরিকা মহাদেশের নিরাপত্তার বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। কিন্তু অনাত্র সচেতনভাবে হস্তক্ষেপ–বিরোধী নীতি অবলম্বন করে এসেছিল। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। কিন্তু শান্তির সময়ে সক্রিয়ভাবে আমেরিকা মহাদেশের বাইরে সামরিক জোটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগ দেবার কোন দৃষ্টান্ত নেই। তাই অধ্যাপক উইলিয়াম কেলর-এর মতে, ভ্যাণ্ডেনবার্গ প্রস্তাব ছিল 'মনরো নীতির লঙ্ঘনকারী'। তিনি লিখেছেন—"The Vandenberg Resolution in effect repudiated the Monroe Doctrine and its guiding principle of hemispheric exclusivity by afferming Washington's willingness to join the Western European regional security system।"[১] ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল North Atlantic Treaty Organisation বা NATO চুক্তির দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১১টি দেশের সঙ্গে ২০ বছরের জন্য আত্মরক্ষামূলক সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে। এই ১১টি দেশ হল—(১) ব্রিটেন, (২) ফ্রান্স, (৩) ইতালি, (৪) নরওয়ে, (৫) আইসল্যাণ্ড, (৬) ডেনমার্ক, (৭) নেদারল্যাণ্ডস, (৮) বেলজিয়াম, (৯) লাক্সেমবার্গ, (১০) পর্তুগাল, (১১) কানাডা। পরে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে এই চুক্তিতে গ্রিস ও তুরস্ক এবং ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম জার্মানি যোগ দেয়। অনেকেই বলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে কূটনৈতিক ভ্রান্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ঠাণ্ডা লড়াই-এ যেমন অবতীর্ণ করেছিল তেমনি কিছু ভুল অনুমান মার্কিনীদের এই NATO গঠনে প্ররোচিত করেছিল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের লাল ফৌজ যে কোন মুহূর্তে ইংলিশ

বাইরে অবস্থিত দেশগুলির সঙ্গে যৌথ সামরিক চুক্তি সম্পাদন : ন্যাটোর চুক্তি

আর্নেস্ট বেভিনের যৌথ সামরিক প্রয়াসের প্রচার

১. The Twentieth Century World–W. R. Kelloar, P. 284

নীতি ঘোষণার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত প্রভাব খর্ব করার জন্য যে নীতি ঘোষণা করে তা সফল করার জন্যই আর্থিক সহায়তা দানের বিষয়টি জরুরী হয়ে উঠেছিল। এক কথায় মার্কিন পরিকল্পনা ছিল অর্থনৈতিক সাহায্যদানের আবরণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত-বিরোধী পদক্ষেপ।"[১]

মার্শাল পরিকল্পনার পর BENELUX অর্থাৎ বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও লাক্সেমবার্গ একত্রে একটি সাধারণ শুল্ক নীতি গ্রহণ করে পারস্পরিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য চুক্তি করে। ১৯৪৮ খ্রিঃ মার্চ মাসে ব্রিটেন ও ফ্রান্স এতে যোগ দিয়ে 'ব্রাসেলস্ সন্ধি জোট' (Brussels Pact) গঠন করে। এতে বলা হয় যে ৫০ বছরের জন্য স্বাক্ষরকারী দেশগুলি পারস্পরিক আত্মরক্ষা, সংস্কৃতি বিনিময় ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। 'তুরিন চুক্তি' দ্বারা তুরস্ককেও এই শুল্ক জোটের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

মার্শাল পরিকল্পনা ও ব্রাসেলস্ সন্ধি জোটের জন্য রাশিয়ার বিরক্তি

মার্শাল পরিকল্পনা এবং ব্রাসেলস্ সন্ধি জোট গঠন করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন দারুণ ক্ষিপ্ত হয়। সোভিয়েত নেতারা ধারণা করেন যে, মার্শাল পরিকল্পনার সহায়তায় পশ্চিমের এই দেশগুলি মার্কিন রাষ্ট্রের মতই রুশ-বিরোধী জোটে পরিণত হবে। দ্বিতীয়ত, ইওরোপের পশ্চিম ভাগে অর্থনৈতিক ভাঙ্গানের ফলে কমিউনিস্ট দলগুলি নির্বাচনে যে সফলতা পাচ্ছিল তা বিনষ্ট হবে। তৃতীয়ত, যদি পশ্চিম জার্মানির F. R. G.-কে মার্শাল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে পশ্চিম জার্মানির অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধু জ্যামিতিক হারে বাড়বে না, সেই সঙ্গে অস্ত্রবলও বাড়ার সম্ভাবনা আছে। পশ্চিমের হাতে আনবিক বোমা থাকায় স্বভাবতই সেভিয়েত রাশিয়া আতঙ্কিত হয়।

কমিনফর্ম, মলোটোভ পরিকল্পনা ও কমেকন গঠন (Formation of COMINFORM, Molotov Plan and COMECON) : আমেরিকার ট্রুম্যান ডকট্রিন ও ট্রুম্যান ডকট্রিনের সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক কর্মসূচি মার্শাল প্লানের পাশ্চাত্য চ্যালেঞ্জের উপযুক্ত জবাব দিতে সোভিয়েত রাশিয়া তৎপরতার সঙ্গে পাল্টা একগুচ্ছ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে 'The Communist Information Bereau' গঠন করেছিল। এটি COMINFORM নামে পরিচিত ছিল।

সোভিয়েত রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত পূর্ব ইওরোপের ৯টি দেশ নিয়ে কমিনফর্ম গঠন এর উদ্দেশ্য সমূহ

প্রাথমিকভাবে এটি ছিল সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত পূর্ব ইওরোপের ৯টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির একটি যৌথ সংগঠন। এই সংগঠন সোভিয়েত আদর্শ অনুসারে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে শিল্পায়ন, সম্পদের রাষ্ট্রীয়করণ ও সমবায় অন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে কাজ শুরু করেছিল। পোল্যান্ডের সাইলেশিয়াতে (২২-২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ খ্রিঃ) ৯টি কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে COMINFORM গঠিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে যুদ্ধের সময় ১৯৪৩ খ্রিঃ কমিনটার্ণ (তৃতীয় আন্তর্জাতিক)

১. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস—প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ. ২১৪

করেন যে—"ট্রুম্যান মিজুরী প্রদেশের খচ্চরতাড়কদের ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলেন"। সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রী মলোটোভ উল্লেখ করেন যে, তিনি ট্রুম্যানের দ্বারা যে ধরনের ভর্ৎসনার সম্মুখীন হন ১৯৪৫-এর এপ্রিল মাসে, সারা জীবনে তিনি সেই জাতীয় আচরণের সম্মুখীন হন নি।

পটসডাম সম্মেলনে নেতাদের মধ্যে গভীর মত-পার্থক্য

এই রকম মত-বিরোধের পটভূমিকায় পটসডাম শীর্ষ সম্মেলন (জুলাই, ১৯৪৫ খ্রিঃ) অনুষ্ঠিত হলে স্বভাবতই কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছান সম্ভব হয় নি। শান্তিচুক্তি রচনার বিষয়ে ঐক্যমত না হওয়ায়, এই বিষয়টি বৈদেশিক মন্ত্রীদের সম্মেলনে স্থির করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জার্মানি ও তার সহযোগী দেশগুলির সঙ্গে কিভাবে শান্তি চুক্তি স্থাপন করা হবে এই বিষয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়।

১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বরে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে পূর্ব-পশ্চিম ঠাণ্ডা লড়াই স্পষ্টভাবে প্রকটিত হয়। প্রথমত, জার্মানির প্রদেয় ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ক্ষতিপূরণ আদায়ে নারাজ হয়। সোভিয়েত রাশিয়া অভিযোগ করে যে, ইয়াল্টা বৈঠকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হলেও এখন জার্মানির সামরিক শক্তিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ক্ষতিপূরণের দাবী নাকচ করছে। সোভিয়েত রাশিয়া ইয়াল্টা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০ মিলিয়ান ডলার ক্ষতিপূরণের অর্ধেক ১০ মিলিয়ান ডলার রাশিয়াকে অবশ্যই দিতে হবে বলে দাবী করেন। এই বাবদে তাঁরা পূর্ব জার্মানি থেকে কল-কারখানার যন্ত্রাংশ তুলে নিয়ে যান। পশ্চিমী শক্তি অধিকৃত পশ্চিম জার্মানি থেকে $\frac{১}{৪}$ ভাগ ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। পশ্চিমী শক্তিগুলি এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব নেন। দ্বিতীয়ত, যে প্রশ্ন নিয়ে তীব্র মতভেদ হয় তা হল, শান্তি চুক্তি হলে জার্মানিতে কি ধরনের সরকার গঠন করে শান্তি চুক্তি করা হবে। সোভিয়েত সরকার জার্মানিতে সম-মনোভাবাপন্ন, সম-আদর্শযুক্ত সরকার ছাড়া অন্য কোন ধরনের সরকার বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। ফলে জার্মানির সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা যায় নি। তৃতীয়ত, জার্মান-পোল সীমান্ত রাশিয়ার দাবীমত ওডার-নাইসি রেখায় মেনে নিতে পশ্চিমী শক্তি অস্বীকার করে। চতুর্থত, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইয়াল্টা চুক্তিমত রাশিয়াকে অংশ গ্রহণের সুযোগ না দিয়ে আনবিক বোমার সাহায্যে জাপান দখলের জন্য রাশিয়া প্রতিবাদ জানায়। এইভাবে রাশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতবিরোধ তীব্র হতে থাকে। আসল কথা ছিল, পূর্ব ইওরোপের ওপর রাশিয়ার তাঁবেদার সরকার স্থাপন পশ্চিমী শক্তিগুলি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। পোল্যাণ্ডে গ্রোটো ওয়াল্ডের দ্বারা, বুলগেরিয়ায় দিমিত্রির দ্বারা, রুমানিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন স্থাপন করায় পশ্চিমী দেশগুলি ভয়ানক চটে যায়। তারা রাশিয়ার এই কাজকে 'সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ' ছাড়া আর কিছু ভাবতে রাজী ছিল না। যেহেতু রাশিয়ার হাতে তখন ছিল বিশাল সেনা ও সমরযন্ত্র, তার দ্বারা রাশিয়া ইচ্ছা করলে পশ্চিমী দেশ

পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের মধ্যে মত-পার্থক্য : পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের আশঙ্কা

'আমারীকরণের' প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কমেকনের কার্যকলাপ পরবর্তীকালে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেও প্রসার লাভ করেছিল।

তবে মার্শাল পরিকল্পনা পশ্চিম ইওরোপে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে আশানুরূপ সাফল্য পেলেও, কমেকন সেই জাতীয় সাফল্য পায় নি। ট্রুম্যান কেইলর (Keylor) মনে করেন যে, কমেকনের লক্ষ্য ছিল পূর্ব ইওরোপীয় দেশগুলির ওপর সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বজায় রাখা। পূর্ব ইওরোপের রসদ ও সম্পদকে ব্যবহার করে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। জয়েন্ট স্টক কোম্পানী গড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছিল এবং বাণিজ্যিক ভারসাম্যকে সোভিয়েত রাশিয়ার অনুকূলে নিয়ে আসা হয়েছিল।

কমেকন অভাবনীয় সাফল্য পায় নি

পরিকল্পিত সোভিয়েত অর্থনীতির সাফল্যের দরুণ সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনীতি এই সময় বেশ শক্তিশালী ছিল। তাই দুই সুপার পাওয়ার আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে অর্থ ব্যবস্থার ঠাণ্ডা লড়াই জমে উঠেছিল। একদিকে মার্শাল প্ল্যান, তার বিপরীতে কমেকন—এই দুই পরস্পর-বিরোধী অর্থনীতিক সংগঠনের কার্যকলাপের সময়কালে ঠাণ্ডা লড়াই ছিল মূলত পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে সমাজবাদী অর্থনীতিক ব্যবস্থার লড়াই।

মার্শাল প্ল্যান ও একমেবু পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে সাম্যবাদী অর্থনীতির লড়াই

এইভাবে পূর্ব ইওরোপের সোভিয়েতীকরণ ও পশ্চিমী ইওরোপের আমেরিকীকরণের ফলে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দুটি ভিন্ন প্রভাব বলয় সৃষ্টি হয়েছিল। আমেরিকার পক্ষ থেকে কেন্নানের বেষ্টনী নীতি, ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন, মার্শাল পরিকল্পনা এবং তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রাশিয়ার পক্ষ থেকে কমিনফর্ম, মলোটোভ প্ল্যান এবং কমেকন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইওরোপ দুটি প্রভাব বলয়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। পূর্ব ইওরোপে গ্রিস ছাড়া ইতিমধ্যে প্রায় সর্বত্রই রাশিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একই ভাবে পশ্চিম ইওরোপে জার্মানির পূর্বাঞ্চল বাদে বাকি সব অঞ্চলই মার্কিন প্রভাব-মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

ইওরোপ দুটি প্রভাব বলয়ে বিভক্ত

যাই হোক, পশ্চিম ও মধ্য ইওরোপে কমিউনিজমের অগ্রগতি মন্দীভূত হয়। কেবলমাত্র মার্শাল পরিকল্পনা এজন্য দায়ী ছিল একথা মনে করলে ভুল হবে। মার্শাল পরিকল্পনার ফলে পশ্চিমের অগ্রগতি হয় এবং এজন্য পশ্চিম ইওরোপে কমিউনিজমের অগ্রগতি ব্যাহত হয় নি। এগুলি অবশ্য ছিল সহকারী কারণ। আসলে পশ্চিমী দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জাতীয়তাবাদ এত প্রখর ও অভঙ্গনীয় ছিল যে, অর্থনৈতিক ধ্বস রোধ হলে সেই মূল্যবোধ আবার জেগে ওঠে। ব্যক্তি স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার, জীবিকার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার সহ মোটামুটি অর্থনৈতিক স্থিতি পশ্চিমকে তার পুরানো সভ্যতা ও মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। একদা নাৎসী জার্মানির

পশ্চিম ও মধ্য ইওরোপে কমিউনিজমের অগ্রগতি ব্যাহত

চ্যানেল পেরিয়ে পশ্চিম ইওরোপকে আক্রমণ করবে। এই সময় ইংল্যান্ডের নেতা আর্নেস্ট বেভিন (Ernest-Bevin) প্রচার করেছিলেন যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এককভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার সম্প্রসারণকে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। সাম্যবাদকে প্রতিরোধ করতে হলে যৌথ সামরিক প্রয়াসের প্রয়োজন। এই যৌথ দায়িত্ব পালন করতে NATO আত্মপ্রকাশ করেছিল।

ন্যাটো চুক্তির উদ্দেশ্য

ন্যাটো বা 'উত্তর আটলান্টিক চুক্তি' সংস্থায় বলা হয় যে, যদি চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির বাইরে কোন রাষ্ট্র চুক্তিভুক্তদের যে কোন রাষ্ট্রের ওপর শসস্ত্র আক্রমণ করে, তবে NATO—চুক্তির অপর সদস্যরা এই আক্রমণকে তাদের নিজেদের ওপর আক্রমণ বলে মনে করবে। পিটার ক্যালভোকোরেসি লিখেছেন—"The North Atlantic Treaty was an association of 12 states which declared that an armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on them all, and that each would, in such an event, go to the help of the ally attacked by taking such action, includeing the use of force, as it deemed necessary।"[১] ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম জার্মানি বা FRG কে NATO চুক্তিভুক্ত করা হলে রাশিয়া ক্রোধে হুতাশন হয়। রাশিয়ার যুক্তি ছিল যে, জার্মানির হাতে পুনরায় অস্ত্র তুলে দিয়ে সোভিয়েত সরকারকে আক্রমণের ছক তৈরি করা হচ্ছে। পশ্চিমী শক্তিগুলির যুক্তি ছিল যে, পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত সাম্রাজ্য ও 'ওয়ারস সামরিক চুক্তির' সম্ভাব্য আগ্রাসনের প্রথম লক্ষ্য হল FRG। তাকে বাঁচাতে NATO চুক্তির অর্ন্তভুক্ত করা হয়।

ন্যাটোর নীতিসমূহ

NATO-র পরিচালনার জন্য সদস্য দেশগুলির বিদেশ মন্ত্রীদের দ্বারা একটি কাউন্সিল, 'North Atlantic Council', গঠন করা হয়। বছরে অন্তত একবার এই কাউন্সিলের অধিবেশন বসার ব্যবস্থা করা হয়। NATO-র সামরিক নীতি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে 'প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা কমিটি' (Defence Planning Committce)-র ওপর। NATO-র প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য মহাসচিবের অধীনে একটি সচিবালয় গঠিত হয়। NATO-র সকল সদস্য রাষ্ট্রের বাহিনীর প্রধানরা বা তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে NATO-র 'সামরিক কম্যান্ড' গঠিত হয়। মার্কিন সেনাপতি প্রখ্যাত ডুইট ডি আইজেনহওয়ার ন্যাটোর সুপ্রিম অ্যালয়েড কমান্ডার বা সর্বোচ্চ অধিনায়ক হন। NATO-প্রতিষ্ঠার পরবর্তী কয়েক মাস পর্যন্ত NATO বাহিনীর হেডকোয়াটার প্যারিসে ছিল। ন্যাটোর অনুসৃত নীতি ছিল 'The Forward strategy" বা অগ্রসরমুখী রণকৌশল এবং এর দ্বারা পশ্চিম ইওরোপের ওপর সোভিয়েত রাশিয়ার আক্রমণকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা করা হয়। নিকট ভবিষ্যতে ন্যাটোর শক্তিবৃদ্ধি করতে জার্মানির বিভাজনের মধ্য দিয়ে নবগঠিত

১. World Politics, 1945–2000–Peter Calvocaressi P. 19

আক্রমণ করতে পারত। পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলি যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকট, বেকার সমস্যায় দুর্দশায় পড়েছিল। নির্বাচনে ফ্রান্স ও ইতালিতে কমিউনিস্টরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে 'কমিউনিস্ট কোয়ালিশন সরকার' গঠন করে। এই অবস্থায় রুশ আগ্রাসনের ভয়ে পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলি ভীত হয়ে পড়ে।

ফুলটন বক্তৃতা (Fulton Speech) : ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর জাপান আত্মসমর্পন করলে, উপসাগরীয় যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ই মার্চ ট্রুম্যানের ঐতিহাসিক নীতির ঘোষণার মাধ্যমে ঠাণ্ডা যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। অন্তর্বর্তী আঠারো মাসে মার্কিন বিদেশ নীতির চরিত্রে কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। আলোচ্য সময়ে সোভিয়েত রাশিয়া পূর্ব ইওরোপে প্রাধান্য স্থাপনে সক্ষম হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান স্টালিন তাঁর এক ঐতিহাসিক বক্তৃতায় কমিউনিজম ও পুঁজিবাদে মৌলিক বৈপরীত্য এবং সংঘাতের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর ভাষনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে, সাম্যবাদ জয়ী না হওয়া পর্যন্ত সমাজতন্ত্রী ও পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ অপ্রতিরোধ্য। স্টালিনের এই জেহাদি মনোভাবের তীব্র প্রতিক্রিয়া পশ্চিমী শক্তিগুলির মধ্যে দেখা গিয়েছিল। অনেকের বক্তব্য, ১৯৪৬ খ্রিঃ ৫ই মার্চ চার্চিলের ভাষনকে 'ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূচনাকাল' বলা হয়ে থাকে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও পশ্চিমী জগতের প্রভাবশালী নেতা উইনস্টন চার্চিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শনে মিসৌরী প্রদেশের ফুলটনে ওয়েস্ট মিনস্টার কলেজে সম্মান-সূচক ডিগ্রী গ্রহণকালে প্রদত্ত বক্তৃতায় মার্কিন দেশকে সোভিয়েত আগ্রাসন সম্পর্কে সতর্ক করেন। এই জটিল পরিস্থিতিতে তিনি যৌথ ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। তাঁর মতে, ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে—এই বাস্তব সত্যটি মেনে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এগোতে হবে। Fulton Speech বা ফুলটন বক্তৃতায় চার্চিল বলেন যে—ইওরোপের একাংশ ষ্টেটিন থেকে ট্রিয়েষ্ট পর্যন্ত সোভিয়েত লৌহ যবনিকার (Iron Curtain) আড়ালে চলে গেছে। এই লৌহ যবনিকার ওপারে কী সব ঘটছে তা বিশ্ববাসী জানে না। চার্চিলের মন্তব্যটি হল—"A shadow has fallen upon the scenes so lately lighted by the allied victory. Nobody knows what Soviet Russia and its Communist International Organisation intends to do in the immediate future, or what are the limits, if any, to their expansive or proselytising tendencies..... From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an iron curtain has descended across the Continent"।[১] চার্চিল মন্তব্য করেছিলেন, যদি মার্কিন দেশ এখনই সতর্ক না হয় তবে সমগ্র ইওরোপ শীঘ্রই সোভিয়েত

উইনস্টন চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতায় সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সতর্কীকরণ ও তার প্রতিক্রিয়া

১. From Yalta to Vietnam–David Horowitz. P. 2

এই মলোটোভ পরিকল্পনা ঘোষণার মাধ্যমে সোভিয়েত রাশিয়া একই সাথে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, সোভিয়েত রাশিয়ার আপত্তির জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিকে মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে সাহায্য দিতে পারে নি। তাই সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিকে তাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য সাহায্য দানের নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এটি ছিল একটি ধারাবাহিক সোভিয়েত উদ্যোগ। নর্মান লো লিখেছেন—"Since Russia refused to allow any of their satellites to accept Amrican aid, Molotov felt they had to be offered an alternative. Agreements between USSR and its satellies negotiated during the Summaer of 1947, it was designed to boost the trade of Eastern Europe."১

মলোটোভ পরিকল্পনা অনুসারে পূর্ব ইওরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলিকে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ

কমেকন গঠন (Formation of Council of Mutual Economic Assistance–CEMA বা COMECON) ঃ সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটোভ ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে Counicil of Mutual Economic. Assistance (CEMA বা COMECON) প্রবর্তন করেন। The plan was basically a set of trade এই অন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠনের সদস্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি ও রুমেনিয়া। পরে আলবেনিয়া ও পূর্ব জার্মানি এর সদস্যপদ নিয়েছিল। কমিউনিস্ট বলয়ভুক্ত রাষ্ট্রগুলিতেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে সাহায্য করা ছিল এর লক্ষ্য। এর উদ্দেশ্য ছিল (১) পূর্ব ইওরোপীয় রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত করা। (২) যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পূর্ব ইওরোপের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা। (৩) পূর্ব ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির শিল্পোন্নয়ন ঘটানো। (৪) ইওরোপের সাম্যবাদী দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানো। কমেকন ছিল মার্শাল পরিকল্পনার দুরভিসন্ধি প্রতিরোধকারী পাল্টা সংগঠন। মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত মার্শাল পরিকল্পনার প্রভাব থেকে পূর্ব ইওরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলিকে সরিয়ে আনার লক্ষেই এই সংস্থা স্থাপন করা হয়েছিল। পূর্ব ইওরোপের রাষ্ট্রগুলির ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক আধিপত্যের পরিপূরক হিসাবে COMECON-এর প্রতিষ্ঠা হয়। পূর্ব ইওরোপের অর্থনৈতিক পরিবর্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের মডেলেই করা হয়। ভারী শিল্প গঠনের ওপর জোর দেওয়া হয়। তার তুলনায় ভোগ্যপণ্য উৎপাদন, পাইকারী শিল্প-কারখানার ওপর কম জোর দেওয়া হয়। অভিজাত ভূস্বামী শ্রেণির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া আরম্ভ হয় এবং একই সঙ্গে 'যৌথ

কমেকন গঠন ও তার উদ্দেশ্য

---

১. Mastering World History–Norman Lowe, P. 201

পরিস্থিতিতে ইওরোপের গণতান্ত্রিক তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছিল। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জেনারেল জর্জ মার্শাল আশঙ্কা করেন যে, এই অর্থনৈতিক দাস ব্যবস্থা বন্ধ করতে না পারলে ফ্রান্স ও ইতালি কমিউনিস্টদের দখলে চলে যাবে। এমন কি ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে কমিউনিস্টদের লাল বন্যা লণ্ডনকে গ্রাস করবে। এমতাবস্থায় প্রথমে ডিন এ্যাকিসন (Achesan) এবং পরে জর্জ মার্শাল মার্কিন সাহায্য-পুষ্ট ইওরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজীবনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং সুপারিশ করেন। এ্যাকিসন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থেই দ্বিধাবিভক্ত ইওরোপকে মার্কিন আর্থিক সহায়তা দানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে থাকেন। এরপর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ই জুন মার্শাল 'ইওরোপীয় অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা' ('European Recovery Programme') হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় ঘোষণা করেন। মার্শাল বলেন যে, যেখানে দারিদ্র, হতাশা ও লোকসংখ্যা বেশি সেখানেই কমিউনিজম শাখা-প্রশাখা ছড়ায়। সুতরাং যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইওরোপের দারিদ্র দূর না করলে ইওরোপকে কমিউনিজমের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। মার্শাল ইওরোপের যুদ্ধ-বিধস্ত দেশগুলিকে মার্কিন অর্থ সাহায্য দিতে প্রস্তাব দেন, যাতে সাহায্য-প্রাপ্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটে। যাতে তারা ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগতভাবে কমিউনিজমের প্রসার রোধ করতে সক্ষম হয়। মার্শাল ইওরোপের আর্থিক পুনরুজ্জীবনের (European Recovery Programme) জন্য এই যে আর্থিক সাহায্যের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন, এই পরিকল্পনাটিই সাধারণভাবে 'মার্শাল পরিকল্পনা' (Marshal Plan) নামে খ্যাত।

ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ এ্যান্ড বিহ্যাবিলিটেশন এ্যাডমিনিস্ট্রেশন গঠন

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ইতিমধ্যে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমী রাষ্ট্রনায়করা 'ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ এ্যান্ড বিহ্যাবিলিটেশন এ্যাডমিনিস্ট্রেশন' বা UNRRA নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করে যুদ্ধ-বিধস্ত ইওরোপের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। প্রধানত হিটলারের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত ইওরোপের দেশগুলিতে আর্থিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে এবং পৃথকভাবে ঐ সব অঞ্চলের কৃষি ও শিল্পের পুনরুজ্জীবনে আর্থিক সহায়তা দিয়ে এই সংস্থা প্রশংসনীয় ভাবে কাজ করেছিল। আমেরিকাই এই ক্ষেত্রে ছিল প্রধান উদ্যোক্তা।

মার্শাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

এখন ইওরোপের পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা ঘোষণার সময় মার্শাল বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি কোন দেশ বা মতাদর্শের বিরুদ্ধে নয়। এই নীতি ক্ষুধা, দারিদ্র্য, হতাশা এবং বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে। মার্কিনীদের লক্ষ্য বিশ্বে একটি 'সক্রিয় অর্থনীতির পুনরুত্থান'। তিনি বলেন, ইওরোপকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে কর্মসূচি প্রণয়ন করবে। অবশ্য প্রকাশ্যে যাই বলা হোক না কেন, মার্শাল পরিকল্পনার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল (১) আর্থিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সাহায্য গ্রহণকারী দেশগুলিকে

সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাবের বাইরে রাখা। অনেকের মতে, করুণা প্রদর্শনের দ্বারা কমিউনিজমকে ধ্বংস করা (Kill Communism by Kindness)। (২) আর্থিক সাহায্য দানের মাধ্যমে পশ্চিম ইওরোপে মার্কিন ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সুগম করা ও (৩) এই পরিকল্পনা গ্রহণকারী দেশগুলিকে নিয়ে একটি 'মার্কিন-অনুগত রাষ্ট্র জোট' গঠন করা। অর্থাৎ মার্শাল পরিকল্পনার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যেমন ছিল তেমনি তার পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থও জড়িত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলির আর্থিক ক্ষতির দরুণ মার্কিন ব্যবসা-বাণিজ্য মার খায়। কারণ ঐ সব দেশের বাজারে মার্কিন পণ্যদ্রব্য বিক্রি হয় নি। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বাণিজ্যিক স্বার্থে ইওরোপের দেশগুলির আর্থিক সংকট মোচনে এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। তাই তারা ইওরোপের দেশগুলিকে ঋণ দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে মার্কিন পণ্য বিক্রির স্থায়ী বাজার গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিল। ট্রুম্যান তাই মার্শাল পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেন—"Two halves of the same walnut" অর্থাৎ একই আখরোটের দুটি ভাগ।

মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তাব দেওয়া হয় যে—(১) সাহায্য গ্রহণকারী দেশগুলি একটি ইওরোপীয় অর্থনৈতিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হবে। (O. E. E. C. বা Organisation of European Economic Co-operation)। (২) এই O. E. E. C. সদস্যভুক্ত দেশগুলি তাদের নিজস্ব সম্পদ এবং মার্শাল পরিকল্পনায় প্রাপ্ত সম্পদ পরস্পরের প্রয়োজনে ব্যবহার করবে। (৩) যে সাহায্য আমেরিকা দিবে তা প্রত্যেক সদস্যের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে দেওয়া হবে।

মার্শাল পরিকল্পনা পূর্ব-পশ্চিম ঠাণ্ডা লড়াই-এর আগুনে ঘি ঢেলে দেয়। এই পরিকল্পনা ইওরোপের সকল দেশের জন্য খোলা ছিল। একমাত্র স্পেনকে এতে যোগ দিতে আহ্বান করা হয় নি। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সাহায্য কিভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে তা আলোচনার জন্য প্যারিসে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ইওরোপীয় বৃহৎ শক্তিগুলির বিদেশ মন্ত্রীদের এক বৈঠক ডাকা হয়। ব্রিটিশ ও ফরাসি মন্ত্রীদ্বয় এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেন। এই সম্মেলনে অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই রুশমন্ত্রী ডি. এম. মলোটোভের নেতৃত্বে ৮৩ জন উপদেষ্টা নিয়ে গঠিত একটি সোভিয়েত প্রতিনিধি দল অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু প্যারিসের সম্মেলনে মলোটোভ অত্যন্ত তীব্রভাবে মার্শাল পরিকল্পনাকে আক্রমণ করেন। (১) তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে, এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানাবার আগে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাঁর সঙ্গে আলোচনার দরকার বোধ করে নি। (২) এই পরিকল্পনাকে তিনি 'ডলার সাম্রাজ্যবাদ' বলে সমালোচনা করেন। (২) এই পরিকল্পনাতে রাশিয়া বা তার তাঁবেদার দেশগুলি কোনভাবে যোগ দিবে না বলে তিনি জানান। (৪) এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলে গ্রহীতা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। (৫) শেষ পর্যন্ত মার্শাল পরিকল্পনাকে 'আমেরিকার নীরক্ত

ইওরোপীয় বৃহৎ শক্তিগুলির বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠক

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্র ও বিশিষ্ট মার্কিন কূটনীতিবিদ। কেন্নান সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি শক্ত প্রতিরোধমূলক নীতির প্রধানতম প্রবক্তা রূপে পরিচিত। কেন্নান যুদ্ধকালীন সময়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত রূপে বহাল ছিলেন। সে সময়ে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ শে ফেব্রুয়ারি কর্মরত অবস্থায় তিনি ওয়াশিংটনে ৮০০০ শব্দের এক দীর্ঘ টেলিগ্রাম পাঠান। ঐ টেলিগ্রামে তিনি স্টালিনের যুদ্ধোত্তর সম্প্রসারণবাদী নীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। এর পর তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নীতি নির্ধারক কমিটির প্রধান উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত হন। ট্রুম্যান নীতির খসড়া রচনায় কেন্নান ও সহকারি পররাষ্ট্র সচিব এ্যাকিসন প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কেন্নান তাঁর টেলিগ্রাম ও প্রবন্ধে সোভিয়েত সম্প্রসারণ প্রতিহত করার জন্য যে পদ্ধতিগত কৌশল নির্দেশিত করেছিলেন তা 'বেষ্টনী নীতি' বা Policy of Containment নামে পরিচিত। কেন্নান বিশ্বাস করতেন, রাশিয়া বরাবরই একটি বর্বর রাষ্ট্র এবং ইওরোপ ও আমেরিকার শক্তি নষ্ট করাই তার একমাত্র লক্ষ্য। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এই লক্ষ্যকেই আরও দৃঢ় করা হয়েছিল। কেন্নান মনে করেন, আগে যা ছিল শুধুই প্রাধান্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা, পরে সেটাই মতাদর্শগত লড়াইয়ের আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়েছে। কেন্নান বলেন যে, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাবে রাশিয়ার নীতি সাম্রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি পুঁজিবাদ-বিরোধী তত্ত্বের প্রচার এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ধ্বংসের লক্ষে প্রযুক্ত। তিনি জঙ্গি মার্কিন নেতাদের অযথা আতঙ্কিত হয়ে 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব ত্যাগ করার পরামর্শ দেন। কেন্নান যে বিকল্প মত দেন তাকে বলা হয় Containment Theory বা সীমাবদ্ধ রাখার বা সহাবস্থানের তত্ত্ব। কেন্নান তাঁর প্রবন্ধে বলেন যে, (১) রাশিয়া এখন আগ্রাসী নয়। রুশ জনগণ রণক্লান্ত, হতাশাগ্রস্থ ও দুর্দশা-পীড়িত। স্টালিন চেষ্টা করলেও রাশিয়াকে আগ্রাসী যুদ্ধে নামাতে সক্ষম হবেন না। (২) রুশ জনগণ এখন শান্তিকামী, একথা ভোলা উচিত নয়। (৩) কোন টোট্যালিট্যারিয়ান রাষ্ট্র যতই শক্তিশালী হোক না কেন, জনমতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে সাহস করবে না। সুতরাং পশ্চিম ইওরোপে এখন রুশ আগ্রাসনের ভয় নেই। (৪) রাশিয়া এখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত নিরাময়ে ব্যস্ত। নতুন কোন যুদ্ধের ঝুঁকি রাশিয়া নেবে না। (৫) রুশ বুদ্ধিজীবীরা শান্তি ও সহাবস্থান চান। তাঁরা স্টালিনকে বোঝাচ্ছেন যে, কমিউনিজম যদি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মতবাদ হয়, তবে তা আপন নিয়মে, ইতিহাসের নিজের গতিতে তা অন্য দেশে স্থান লাভ করবে। সোভিয়েত রাশিয়াকে বিশ্ব-বিপ্লবের জন্য কেন কাট-খড় পোড়াতে হবে? ইতিহাসই কমিউনিজমকে জয়ী করবে। (৬) সুতরাং বিশ্ব-বিপ্লবের জন্য রাশিয়ার আত্মত্যাগ করার দরকার কি? (৭) তার অর্থ এই নয় যে, রাশিয়া বিশ্ব-বিপ্লব থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে। যেখানে অনুকূল পরিস্থিতি থাকবে এবং অভ্যন্তরীণ কারণে স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব ঘটবে, সেখানে রাশিয়া নিশ্চয় সহায়তা দেবে। নতুবা বিপ্লব রপ্তানি করা যাবে না। (৮) কেন্নান পরামর্শ দেন যে,

মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ কেন্নানের Containment Theory বা সীমাবদ্ধ রাখার বা সহাবস্থানের তত্ত্ব ঃ বেষ্টনী নীতি

ভেঙ্গে দেওয়া হয়। কমিনফর্ম ছিল কমিনটার্নের আধুনিক রূপ। স্টালিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী রুশ নেতা জাদানভ (Zhadanov) এই সংগঠনটির প্রধান রূপকার হিসাবে গণ্য। যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে কমিনফর্মের প্রধান দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পূর্ব ইওরোপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বতন্ত্র পরিমণ্ডলকে মার্শাল পরিকল্পনার সম্ভাব্য প্রভাব থেকে দুরমুক্ত করার জন্যই কমিনফর্ম একটি সমাজতান্ত্রিক আন্তরাষ্ট্রীয় সংস্থা হিসাবে গঠিত হয়েছিল। কমিনফর্ম-এর উদ্দেশ্য ছিল—(১) তাঁবেদার সরকারগুলির কোন নীতি কমিনফর্মের অনুমোদন ছাড়া কার্যকরী হতে না দেওয়া। (২) পশ্চিম ইওরোপ ও আমেরিকার কমিউনিস্ট দলগুলিকে কঠোর শৃঙ্খলায় এনে মস্কোর নির্দেশিত প্রচার চালাতে বাধ্য করা। পূর্ব ইওরোপের দেশগুলির পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কর্মসূচিতে সংহতি ও সামঞ্জস্য আনা। (৩) আপাতত তাদের কাজ ছিল মার্শাল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রচার করা ও আমেরিকার আণবিক বোমা নির্মাণের বিরুদ্ধে জনমত গঠন। যতদিন না রাশিয়া আণবিক বোমা নির্মাণে সক্ষম না হয় ততদিন বিশ্বজনমতকে আমেরিকার আণবিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রভাবিত করে আমেরিকার হাত বেঁধে রাখা। (৪) কমিনফর্মের মাধ্যমে পশ্চিমী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার করা। মোট কথা, কমিনফর্মের মাধ্যমে যেমন বিশ্বের নানা দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কার্যকলাপ সুসংহত করার উদ্যোগ গৃহীত হয় তেমনি অন্যদিকে পাশ্চাত্য-বিরোধী প্রচারের মাত্রা ও সুর চড়া হয়। এর পাশাপাশি রাশিয়া পশ্চিম ইওরোপের বিশেষত ফ্রান্স ও ইতালির কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে সরকার–বিরোধী জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিল। ধারণা করা হয়েছিল যে, আন্দোলনের ফলে ঐ দুটি দেশের যৌথ সরকারগুলির পতন ঘটবে এবং কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হবে। নতুন রণকৌশল অনুসারে পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিতেও নিয়ন্ত্রণের মাত্রা তীব্র হয়। উইলফ্রিড ন্যাপ লিখেছেন—"The purpose of the organization was to provide the institutional frame- work and even more the cover behind which Eastern Europe could be forced into a concentrated mould."[১] প্রকৃতপক্ষে, কমিনফর্মের মাধ্যমে পূর্ব ইওরোপের কমিউনিস্ট--শাসিত দেশগুলির সংহতি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠিত হয়েছিল।

মলোটোভ পরিকল্পনা (The Molotov Plan, 1949) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল প্ল্যানের বিকল্প হিসাবে সোভিয়েত রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী মলোটোভ ১৯৪৯ খ্রিঃ পূর্ব ইওরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। এই পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল, সোভিয়েত রাশিয়ার আদর্শে উদ্বুদ্ধ পূর্ব ইওরোপের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ থেকে এই পরিকল্পনা অনুসারে উদার আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে নিজ নিজ দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করতে পারবে।

১. A History of War and Peace–W. Knapp, P. 122

এই মলোটোভ পরিকল্পনা ঘোষণার মাধ্যমে সোভিয়েত রাশিয়া একটি সাথে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, সোভিয়েত রাশিয়ার আপত্তির জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিকে মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে সাহায্য দিতে পারে নি। তাই সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিকে তাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য সাহায্য দানের নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এটি ছিল একটি ধারাবাহিক সোভিয়েত উদ্যোগ। নর্মান লো লিখেছেন—"Since Russia refused to allow any of their satellites to accept Amrican aid, Molotov felt they had to be offered an alternative. Agreements between USSR and its satellies negotiated during the Summaer of 1947, it was designed to boost the trade of Eastern Europe."১

মলোটোভ পরিকল্পনা অনুসারে পূর্ব ইওরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলিকে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য প্রদান

কমেকন গঠন (Formation of Council of Mutual Economic Assistance–CEMA বা COMECON) : সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটোভ ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে Counicil of Mutual Economic. Assistance (CEMA বা COMECON) প্রবর্তন করেন। The plan was basically a set of trade এই অন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠনের সদস্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি ও রুমেনিয়া। পরে আলবেনিয়া ও পূর্ব জার্মানি এর সদস্যপদ নিয়েছিল। কমিউনিস্ট বলয়ভুক্ত রাষ্ট্রগুলিতেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে সাহায্য করা ছিল এর লক্ষ্য। এর উদ্দেশ্য ছিল (১) পূর্ব ইওরোপীয় রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত করা। (২) যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পূর্ব ইওরোপের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা। (৩) পূর্ব ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির শিল্পোন্নয়ন ঘটানো। (৪) ইওরোপের সাম্যবাদী দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানো। কমেকন ছিল মার্শাল পরিকল্পনার দুরভিসন্ধি প্রতিরোধকারী পাল্টা সংগঠন। মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত মার্শাল পরিকল্পনার প্রভাব থেকে পূর্ব ইওরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলিকে সরিয়ে আনার লক্ষেই এই সংস্থা স্থাপন করা হয়েছিল। পূর্ব ইওরোপের রাষ্ট্রগুলির ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক আধিপত্যের পরিপূরক হিসাবে COMECON-এর প্রতিষ্ঠা হয়। পূর্ব ইওরোপের অর্থনৈতিক পরিবর্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের মডেলেই করা হয়। ভারী শিল্প গঠনের ওপর জোর দেওয়া হয়। তার তুলনায় ভোগ্যপণ্য উৎপাদন, পাইকারী শিল্প-কারখানার ওপর কম জোর দেওয়া হয়। অভিজাত ভূস্বামী শ্রেণির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া আরম্ভ হয় এবং একই সঙ্গে 'যৌথ

কমেকন গঠন ও তার উদ্দেশ্য

---

১. Mastering World History–Norman Lowe, P. 201

প্রয়োগের মধ্য দিয়ে পশ্চিম ইওরোপে আমেরিকার 'নয়া পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক তত্ত্ব' (Neo-Capitalist Economic Theory) রূপদী অর্থনৈতিক তত্ত্বের জায়গা নিয়েছিল। এই সময় পুঁজিবাদী দেশগুলিকে সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য আমেরিকা 'নয়া পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক তত্ত্ব' গ্রহণের পরামর্শ দেয়। তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন কেইনস্ (Keynes)। ইতিমধ্যেই পশ্চিম ইওরোপীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই কর্তৃত্ব পশ্চিমী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি ও ইতিপূর্বে গঠিত ইওরোপীয় ইকনমিক কমিউনিটি (European Economic Community) মেনে নিয়েছিল। আবার পশ্চিম ইওরোপের আর্থিক পুনরুজীবন আমেরিকার পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছিল। সাহায্য-প্রাপ্ত ১৬টি রাষ্ট্রের আমদানির দুই-তৃতীয়াংশ আমেরিকা থেকে আসার দরুণ আমেরিকার অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। এই সময়কালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মার্কিন ডলার প্রধানতম বিনিময় মুদ্রার স্থান অর্জন করেছিল। আলোচ্য সময়ে আন্তরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ব্যবস্থায় সংহতি সাধনের জন্য আমেরিকার উদ্যোগে ১৯৪৭ খ্রিঃ শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি সাধারণ চুক্তিমূলক ব্যবস্থা (General Agreement on Tariffs and Trade বা GATT) গঠন করা হয়। এই সংস্থার উদ্যোগে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা শিথিল করা হয়েছিল। এর ফলে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে বার্ষিক শতকরা সাত ভাগ হারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। সবচেয়ে বড় কথা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম ইওরোপে সাম্যবাদকে ঠেকানো, তার সেই স্বপ্ন সার্থক হয়। সাম্যবাদী অভ্যুত্থানের আশঙ্কা থেকে ফ্রান্স ও ইতালি মুক্তি পায়। মার্শাল পরিকল্পনা ঠাণ্ডা লড়াইকে তীব্রতর করেছিল। ঐতিহাসিক ফ্লেমিং ও হ্যালে দুজনেই মনে করেন যে, প্রস্তাব হিসাবে হয়তো মার্শাল প্ল্যান তেমন মন্দ কিছু ছিল না। কিন্তু ট্রুম্যান ডকট্রিনের পর এই পরিকল্পনাকে সোভিয়েত রাশিয়া কিছুতেই সরলভাবে মেনে নিতে পারে নি।

মার্শাল পরিকল্পনা সামগ্রিক বিচারে বিশ্ব-রাজনীতির পক্ষে শুভ হয় নি। এর ফলে ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতির মাত্রা ঘনীভূত হয়। ইওরোপীয় মহাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি দুটি সুস্পষ্ট বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনা একটা কল্যাণকর প্রচেষ্টা ছিল সন্দেহ নেই। তবে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত

মার্শাল পরিকল্পনা বিশ্ব-রাজনীতির পক্ষে শুভ হয় নি

ভাবে এই পরিকল্পনা রূপায়িত করা হয়েছিল। যদি আমেরিকা আন্তরিকভাবেই ইওরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য আগ্রহী ছিল, তাহলে এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য কোন বিকল্প কাঠামো না গড়ে তুলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আর্থ-সামাজিক বিষয়-সংক্রান্ত সংস্থার হাতে ঐ অর্থ দিতে পারত। মার্শাল পরিকল্পনা রাষ্ট্রসঙ্ঘের গুরুত্বকে খাটো করে দেখেছিল। আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে পশ্চিম ইওরোপের আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছিল। তাহলে ইওরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য দু'বছর আমেরিকাকে কেন আপেক্ষা করতে হল। এতেই সন্দেহ জাগে। অধ্যাপক প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চে ট্রুম্যান

মূল্যের সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দান করা হলে, এই দুই দেশে কমিউনিস্ট হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়। ট্রুম্যান নীতি ক্রমে বিশ্বের সর্বত্র মার্কিন দেশের 'মিত্র রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে একটি বলয়' রচনা করে। এই বলয়ের বাইরে সোভিয়েত প্রভাবকে সীমিত রাখা হয়। দক্ষিণ কোরিয়া বা ভিয়েতনাম বা বার্লিন কোন স্থানে এই বলয় শক্তি ভাঙ্গতে চেষ্টা করলে স্থানীয় প্রক্সি যুদ্ধের (Proxy war) দ্বারা বা সীমিত যুদ্ধের দ্বারা আক্রমণকারীকে বলয়ের বাইরে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়।

ট্রুম্যান নীতির উদ্দেশ্য

ট্রুম্যান নীতি যুদ্ধোত্তর মার্কিন ও বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী দিকচিহ্ন বলে গণ্য করা হয়। উল্লেখ করা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ঐতিহ্যবাহী 'মনরো নীতি' অনুসারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত অনেকাংশে বিচ্ছিন্নতার নীতি অনুসরণ করে চলেছিল। কিন্তু ট্রুম্যান নীতি সেই পরস্পরামূলক ব্যবস্থার ওপর চিরতরে যবনিকা টেনে দিয়েছিল। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মার্কিন হস্তক্ষেপের কথাই বলেছেন। যে সব দেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সাম্যবাদের প্রভাব পড়বে এবং তার ফলে যদি ঐ সকল দেশে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় আমেরিকা সেই সকল দেশকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দান করতে এগিয়ে যাবে। অর্থাৎ আমেরিকা নিজেকে 'পৃথিবীর অভিভাবকে পরিণত' করতে বদ্ধ-পরিকর মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাঁর ঘোষণায় বুঝিয়েছিলেন।

ট্রুম্যানের নীতির সমালোচনা

ট্রুম্যান নীতি ঘোষণার ফলে এক বিশ্বজনীন সক্রিয় হস্তক্ষেপমুখী পররাষ্ট্র নীতির অবতারনা হয়। ট্রুম্যান বলেন যে, পৃথিবী বিভক্ত হয়েছে দুটি পরস্পর-বিরোধী জীবনচর্চার মধ্যে এবং তাঁর মতে প্রয়োজনে অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে মার্কিন জীবনচর্চার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলার জন্য সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অবৈধ নয়। (১) ট্রুম্যান নীতির সমালোচনা করেছেন মার্কিন সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান। তাঁর মতে, এই ট্রুম্যান নীতি মার্কিন বিদেশ নীতিকে তীব্র সোভিয়েত-বিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াশীল করে তুলেছিল। তিনি বলেছেন, এই নীতির দ্বারা আমেরিকার উদ্দেশ্যই হয়ে ওঠে সোভিয়েত রাশিয়ার সব কাজে বিরোধিতা করা। (২) ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিনের ফলে আমেরিকাকে সোভিয়েত কমিউনিজম প্রসার রোধের জন্য এখন থেকে একগুচ্ছ তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠনে তৎপর হতে হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে সব রাষ্ট্রগুলি প্রকৃতি ও শাসন কাঠামোয় ছিল 'স্বৈরতান্ত্রিক ও গণতন্ত্র বিরোধী'। ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত লাতিন আমেরিকা, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই ধরণের বেশ কয়েকটি আমেরিকাপন্থী একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। (৩) ট্রুম্যানের ঘোষণায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অবহেলিত হয়েছিল। এর গুরুত্ব অনেকটা কমে যায়। গ্রিস ও তুরস্ককে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে সাহায্য দেওয়া যেত। সোভিয়েত রাশিয়া হয়তো সে ক্ষেত্রে ভেটো প্রয়োগ করে এই ব্যবস্থাকে বানচাল করার চেষ্টা করত। সে-ক্ষেত্রে বিশ্বজনমতের কাছে সোভিয়েত রাশিয়ার ভাবমূর্তি নষ্ট হত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্ব আরও বাড়ত। এই ট্রুম্যান নীতির দ্বারা প্রকৃত অর্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় ঐক্য রক্ষা করার নামে অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ

ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথা গরম করে Liberation War বা মুক্তিযুদ্ধের বুলি নেওয়ার কোন দরকার নেই। মার্কিন সরকারের উচিত সোভিয়েত প্রভাব যে অঞ্চলে আছে তাকে সেই অঞ্চলে 'সীমাবদ্ধ রাখা' (Containment)। সেই সীমা ছেড়ে কোন কোন স্থানে সোভিয়েত রাশিয়া বা তার তাঁবেদার রাষ্ট্র আগাতে চাইলে তাকে ঠেলে তার পূর্ব সীমায় ফিরিয়ে দেওয়া অথবা স্থিতাবস্থায় রাখা। এই নীতির নাম হয় Policy of Containment বা বেষ্টনী নীতি। কেন্নান সাম্যবাদের অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য সোভিয়েত রাশিয়াকে তার দখলীকৃত অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ওপরই জোর দিয়েছেন। এই নীতিকে কেন্নানের 'বিরোধী প্রভাব সীমায়িত করণের নীতি'ও বলা হয়। রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ও তাঁর মন্ত্রীসভা জর্জ এফ. কেন্নানের যুক্তিকে মেনে নেন এবং মার্কিন নীতি অতঃপর Containment নীতি অনুসারে পরিচালিত হয়।

মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র সচিবের নিকট ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের দুটি গোপন নোট প্রেরণ

ট্রুম্যান নীতি (Truman Doctrine) ঃ কেন্নানের Policy of Containment বা 'বেষ্টনী নীতি' দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের চলমান ঠাণ্ডা যুদ্ধকে তীব্র করেছিল। কেন্নানের এই থিসিস ঠাণ্ডা যুদ্ধকে যে স্তরে নিয়ে গিয়েছিল ট্রুম্যানের মতবাদ তাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিল। কেন্নানের 'Policy of Containment'-এর পরিপূরক ও সম্প্রসারিত রূপ ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানের পররাষ্ট্র সম্পর্কিত বিশেষ নীতিটি।

সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে এই সময় (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ) থেকে পশ্চিমী শক্তিগুলির সঙ্গে সম্পর্কের প্রচণ্ড অবনতি ঘটেছিল। Eric Hobsbawn বলেছেন যে, কেন্নান পরিকল্পিত 'Policy of Containment'-কে ওয়াশিংটন বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল ও তার যথাসাধ্য প্রয়োগ সাধন করেছিল। ("George Kennan, The American diplomat who in early 1946 formulated the 'Containment' policy which Washington adopted with enthusiasm....."[১]। পারস্পরিক অবিশ্বাস তীব্রতম ছিল। সুতরাং মার্কিন Containment নীতিকে সোভিয়েত সরকার 'পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের বেড়াজাল নীতি' বলে ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যখন কেন্নানের নীতি নিয়ে পর্যালোচনায় রত ছিলেন সেই সময় ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে দুটি গোপন নোট মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র সচিব ডিন এ্যাকিসনের হাতে আসে। এই নোটে ১৯৪৭ খ্রিঃ ২৪ শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটেন জানায় যে (১) গ্রিসে ব্রিটেনের দখলদারী সেনা ব্রিটেন আর বেশি দিন রাখতে সক্ষম নয়। গ্রিস, জার্মানি, ট্রিয়েষ্ট ও অস্ট্রিয়াতে দখলদারী সেনা রাখার ব্যয়ভার বহন করতে ব্রিটেন অক্ষম। ব্রিটেন আপাততঃ গ্রিস থেকে দখলদারী সেনা সরাবে। এদিকে গ্রিক কমিউনিস্টরা, যুগোশ্লাভ, হাঙ্গেরীয় ও অস্ট্রিয় কমিউনিস্ট এবং তাদের পশ্চাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় গ্রিসের বৈধ রাজতন্ত্রী সরকারকে

১. The Age of Extremes–Eric Hobsbawm, P. 233.

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অকস্মাৎ মৃত্যু হয় (এপ্রিল, ১৯৪৫)। তাঁর স্থলে আসেন উপরাষ্ট্রপতি হ্যারী ট্রুম্যান। ইংলান্ডে প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলও নির্বাচনে পরাস্ত হয়ে পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থলে আসেন শ্রমিক দলের প্রধানমন্ত্রী এটলী। পুরাতন নেতাদের এই অকস্মাৎ পরিবর্তনের ফলে মিত্রশক্তির মধ্যে যুদ্ধকালীন পারস্পরিক বোঝাপড়া বিনষ্ট হয়। নব-নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যান দুর্ভাগ্যবশত রুজভেল্টের আপোসপন্থী নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বিশেষ করে কমিউনিজমের ব্যাপারে ট্রুম্যান কঠোর মানসিকতার পরিচয় দেন। নব-নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারী ট্রুম্যানের শাসনকালে রুশ-মার্কিন সম্পর্কের পরিবর্তনের সূচনা হয়। ঐতিহাসিক Fleming-এর মতে, ট্রুম্যান ছিলেন বৈদেশিক সম্পর্ক বিশেষত রুশ-মার্কিন সম্পর্ক বিষয়ে অনভিজ্ঞ। মার্কিন পেন্টাগন বা সেনাপতিমণ্ডলী রুজভেল্টের রুশ নীতির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁরা রুজভেল্টের দ্বারা স্বীকৃত ইয়াল্টা চুক্তিকে "আমেরিকার আত্মসমর্পণ নীতির পরাকাষ্ঠা" বলে মনে করতেন। পেন্টাগন ছিল যুদ্ধবাজ সেনাপতিদের দপ্তর। এই দপ্তরের প্রধান এ্যাডমিরাল লিহি (Admiral Leahy) ট্রুম্যানকে বোঝান যে, এখন সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে দৃঢ় নীতি নেওয়া দরকার। পূর্ব ইওরোপে রুশ প্রাধান্য ও মাঞ্চুরিয়ায় লাল ফৌজের অবস্থান মার্কিন নেতাদের ঈর্ষা ও বিরক্তির কারণ হয়। ট্রুম্যানও বাস্তব অবস্থা না বুঝে পেন্টাগনের পরামর্শে রাশিয়া সম্পর্কে কড়া নীতি নেন।

ইতিমধ্যে সোভিয়েত সরকারও পূর্ব ইওরোপে তাঁদের আধিপত্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দৃঢ় করার কাজে হাত দেন। ঐতিহাসিক আইজ্যাক ডয়েৎসার-এর মতে, সোভিয়েত রাশিয়ার এই প্রচেষ্টা ছিল আত্মরক্ষামূলক। রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্ত পথে অর্থাৎ পোল্যান্ড ও বাল্টিক সীমান্তের পথে রাশিয়া জার্মানির দ্বারা আক্রান্ত হয়। সুতরাং স্টালিন ইয়াল্টা বৈঠকেই একথা জানান যে, পোল্যান্ড, রুমানিয়া প্রভৃতি প্রতিবেশি দেশে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি মিত্র-ভাবাপন্ন সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকার রাশিয়া বরদাস্ত করবে না। রাশিয়ার আত্মরক্ষার জন্য এটি খুব দরকারী ছিল। রুজভেল্ট পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সম্পর্কে কঠোর মনোভাব দেখান নি। কিন্তু ট্রুম্যান মনে করেন যে, রুমানিয়া ও পোল্যান্ডে সোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধি ছিল সোভিয়েত আগ্রাসন এবং ইয়াল্টা চুক্তির বিরোধী। এইভাবে মত-পার্থক্য দেখা দেয়।

পূর্ব ইওরোপে রাশিয়ার আধিপত্য রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়

পোল্যান্ডে পোল কমিউনিস্টদের দ্বারা লাল ফৌজের আশ্রয়ে সরকার গড়া হলে মার্কিন প্রশাসন অত্যন্ত বিরক্ত হয়। রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মলোটোভ ট্রুম্যানকে শুভেচ্ছা জানাতে এলে, ট্রুম্যান কড়া ভাষায় পোল্যান্ডে ইয়াল্টা চুক্তি অনুসারে অবাধ নির্বাচন না হওয়ায় ক্ষোভ দেখান। পূর্ব ইওরোপের ব্যাপারে ইয়াল্টা চুক্তি অনুযায়ী সমস্ত সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে কার্যকর করার জন্য ট্রুম্যান সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে কঠোরভাবে বলেন। ট্রুম্যানের ভাষা সম্ভবত কূটনৈতিক ভব্যতাযুক্ত ছিল না। এজন্য মলোটোভ মন্তব্য

পোল্যান্ডে পোল কমিউনিস্টদের দ্বারা সরকার গঠিত হলে ট্রুম্যানের বিরক্তি প্রকাশ

উৎখাতের জন্য ভয়ানক গৃহযুদ্ধ চালাচ্ছে। ব্রিটিশ সেনা স্থিতাবস্থা রক্ষা করছে। এই সেনাদল অপসারিত হলেই গ্রিস কমিউনিস্টদের হাতে চলে যাবে। পূর্ব ভূমধ্যসাগরে পশ্চিমী আধিপত্যের শেষ চিহ্ন লোপ পাবে। (২) তুরস্কের সঙ্গে রাশিয়ার মন্ত্রো চুক্তি (Montreaux Convention) ভেঙ্গে রাশিয়া নতুন চুক্তি গঠনের জন্য তুরস্ককে চাপ দিচ্ছে। এই নতুন চুক্তিতে রাশিয়া দার্দানালিস ও বসফোরস প্রণালীতে অবাধ রুশ নৌ-চলাচলের অধিকার চায় এবং তুরস্কে বিশেষ বাণিজ্যিক অধিকার চায়। ব্রিটেন সতর্ক করে যে, রাশিয়া তুরস্কে ঢুকতে পারলে মধ্যপ্রাচ্যের তৈলখনি অঞ্চলগুলিতে আধিপত্য পেয়ে যাবে। (৩) ইরাণে যুদ্ধকালীন দখলদারী শেষ হলেও রুশ সেনা উত্তর ইরাণ ছাড়ছে না। রুশ প্রভাবিত তুদে (Tudeh) দল উত্তর ইরাণের তৈল-সমৃদ্ধ আজেরবাইজান প্রদেশ রাশিয়াকে হস্তান্তরের জন্য চাপ দিচ্ছে।

এটা ঠিক যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে ইংলণ্ডের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছিল। তার আর্থিক অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল যে, সিগারেটের তামাক আমদানি করার সঙ্গতিও তার ছিল না। আমেরিকা অনুভব করেছিল যে ব্রিটেন গ্রিস থেকে হাত গুটিয়ে নিলে মস্কোর মদতপুষ্ট কমিউনিস্টরা গ্রিসের গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করবে এবং গ্রিস সোভিয়েত রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। গ্রিস কমিউনিস্টদের দখলে চলে গেলে তুরস্কেও কমিউনিস্টদের প্রভাব বাড়বে। ফলে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি নতুন আকার ধারণ করবে। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধান ট্রুম্যান সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

এই নোট পাওয়ার পরই ট্রুম্যান আর কাল বিলম্ব না করে Containment নীতির প্রথম ধাপ হিসাবে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে 'ট্রুম্যান ডকট্রিন' ঘোষণা করেন। মার্কিন কংগ্রেসের অধিবেশনে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ই মার্চ ট্রুম্যান বলেন যে, "মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য হল এমন একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশ গঠন করা যার ফলে সকল জাতি স্বাধীনভাবে, বলপ্রয়োগ ছাড়াই বসবাস করতে পারে।

ট্রুম্যান ডকট্রিন ঘোষণা

-----আমরা আমাদের এই আদর্শকে কখনও কার্যকরী করতে পারব না, যদি আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন জনগণকে, তাদের জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার ওপর সর্বাত্মক রাষ্ট্রের আক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করতে বিরত থাকি।------যেখানে বৈধভাবে গঠিত সরকারগুলিকে সশস্ত্র সংখ্যালঘুরা আগ্রাসন দ্বারা উচ্ছেদের চেষ্টা করবে, সেখানে মার্কিন দেশ বৈধ রাষ্ট্রকে ক্ষমতায় রাখতে সাহায্য করবে।-----আমেরিকা মনে করে যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সর্বাত্মক রাষ্ট্রের আগ্রাসন বিশ্বশান্তি বিনষ্ট করবে এবং পরিণামে আমেরিকার নিরাপত্তা বিনষ্ট করবে। ("....it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting subjugation by the armed minorities or outside pressures")। মার্কিন রাষ্ট্রপতির এই ঘোষণা Truman Doctrine নামে পরিচিত হয়েছে। সোভিয়েত আগ্রাসন প্রতিরোধ করাই ছিল এই ঘোষণার মূল লক্ষ্য।

ট্রুম্যানের ঘোষণা অনুসারে আপততঃ গ্রিস ও তুরস্ক সরকারকে ৪০০ মিলিয়ান ডলার

সাম্রাজ্যবাদ' আখ্যা দিয়ে তিনি ব্রোঞ্জে সম্মেলন ত্যাগ করেন। ইওরোপে 'দাসত্বের দিন' (Enslavement of Europe) ঘনিয়ে এসেছে বলে তিনি হতাশা প্রকাশ করেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে মলোটোভ মার্শাল পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেন।

অতঃপর ঠান্ডা লড়াই তীব্র হতে শুরু করে। সাম্যবাদীদের সার্বিক বিরোধিতা সত্ত্বেও মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের উদ্যোগে ১৬টি ইওরোপীয় দেশকে (ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ড, গ্রিস, আইসল্যান্ড, লাক্সেমবার্গ, নরওয়ে, পর্তুগাল, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, তুরস্ক) ইওরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা বা O E E C (Origanisation of European Economic Cooperation) গঠিত হয়েছিল। রাশিয়ার চাপে পূর্ব ইওরোপের ৮টি দেশ (আলবানিয়া, বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া) মার্শাল পরিকল্পনায় যোগদানে বিরত থাকে। ইওরোপ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে থাকে ট্রুম্যান নীতি ও মার্শাল পরিকল্পনা সমর্থনকারী ১৬টি দেশ, অপরদিকে রাশিয়া ছাড়া তার তাঁবেদার ৮টি দেশ। O E E C 'ইওরোপীয় পুনরুজীবন কর্মসূচি' (European Recovery Programme) পেশ করেছিল। এই কর্মসূচি রূপায়নের ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩৩ বিলিয়ন ডলার। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ১৭ বিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করার জন্য মার্কিন কংগ্রেসে বিল উত্থাপন করেন। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেস Economic Cooperation Act (1948) পাশ করে ইওরোপীয় দেশগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য ১৩ বিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করেছিল। ১৯৪৮ খ্রিঃ থেকে ১৯৫১ খ্রিঃ পর্যন্ত এই কর্মসূচি চালু রাখতে আরো ১২ বিলিয়ন ডলার আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছিল। এর মধ্যে ফ্রান্স পেয়েছিল ২·৭ বিলিয়ন, ব্রিটেন পায় ৩·২ বিলিয়ন, ইতালি ১·৫ বিলিয়ন, পশ্চিম জার্মানি ১·৪ বিলিয়ন। কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠনে এই সাহায্য লাভ করেছিল।

মার্শাল পরিকল্পনার জন্য ইওরোপ দুই শিবিরে বিভক্তিকরণ

মার্শাল পরিকল্পনার ফলাফল (Results of the Marshall Plan) : অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুই দিক দিয়েই মার্শাল পরিকল্পনা তার লক্ষ্য পূরণে সফল হয়েছিল। পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্যের ফলে ইওরোপের আর্থিক জীবনে যে মন্দা এসেছিল তা কেটে গিয়েছিল। উৎপাদনের মাত্রা বিশ্বযুদ্ধের আগে যা ছিল তার থেকে বেড়েছিল। ইংলন্ডের রপ্তানি বেড়েছিল, ফ্রান্সের মুদ্রাস্ফীতি কমেছিল। পশ্চিম জার্মানির উৎপাদন ১৯৩৬ এর স্তরে উন্নীত হয়েছিল। মার্শাল পরিকল্পনায় আমেরিকার স্বার্থও পূরণ হয়েছিল। মার্কিন বাণিজ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সব দিক দিয়েই আমেরিকার লাভ হয়েছিল। একথা মনে রাখা উচিত যে, ট্রুম্যান ডক্ট্রিন ও মার্শাল প্ল্যান-এর মিলিত উদ্দেশ্য ছিল ইওরোপে পুঁজিবাদকে শক্তিশালী করা। মার্শাল প্ল্যান

মার্শাল পরিকল্পনা দ্বারা আমেরিকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণ হয়

বিরুদ্ধে পশ্চিমী গণতন্ত্রের যে ঘৃণা দেখা দিয়েছিল এখন রুশী কমিউনিজমের বিরুদ্ধেও একই ঘৃণা দেখা যায়। এ ব্যাপারে পশ্চিম ইওরোপের উদারতন্ত্রী, রক্ষণশীল, শ্রমিক দল, সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল না।

সামরিক জোট গঠন (Formation of Military Alliances) : সামরিক জোট গঠন নতুন কিছু নয়। বিসমার্ক জার্মানিকে কেন্দ্র করে ইওরোপের প্রধান শক্তিগুলির সাহায্যে 'মৈত্রী জোট' গঠনের চেষ্টা করেন। বিসমার্ক ১৮৭৯ খ্রিঃ অস্ট্রো-জার্মান-দ্বিশক্তি চুক্তি ও পরে ১৮৮২ খ্রিঃ জার্মানি-অস্ট্রিয়া ও ইতালির মধ্যে ট্রিপল অ্যালায়েন্স (Triple Alliance) বা ত্রিশক্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। ১৮৯৩ খ্রিঃ ফ্রাঙ্কো-রুশ আঁতাত এবং ১৯০৪ খ্রিঃ ও ১৯০৭ খ্রিঃ ইঙ্গ-ফরাসি এবং ইঙ্গ-রুশ আঁতাতের ফলে ত্রিশক্তি আঁতাত (Triple Entente) গঠিত হলে ইওরোপ শেষ পর্যন্ত Triple Allance বনাম Triple Entente—এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বি শিবিরে বিভক্ত হয়। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ফ্রান্স তীব্রভাবে মৈত্রী জোট গঠনের নীতি কার্যকর করতে চেষ্টা করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরিণতিতে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকেই ইওরোপ দুটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের নেতৃত্বাধীন দুটি প্রভাবাধীন অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য 'আঞ্চলিক সামরিক জোট' গঠনের দিকে সচেষ্ট হয়। ঠাণ্ডা লড়াই যে কোন মুহূর্তে গরম যুদ্ধে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সে রকম কোন বিপর্যয় ঘটলে পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলি সশস্ত্র যুদ্ধে এককভাবে আত্মরক্ষায় অক্ষম ছিল। কারণ রাশিয়ার অধীনে ৪ মিলিয়ান লাল ফৌজ পুরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। এখন রাশিয়া দাবী করছিল যে, তার হাতে আণবিক বোমা এসে গেছে। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়া প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষা চালায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান ঘটে। বার্লিন অবরোধ দ্বারা রাশিয়া ইচ্ছা করলে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিকে কিভাবে কোণঠাসা করার ক্ষমতা রাখত রাশিয়া তার পরিচয় দিয়েছিল। রাশিয়ার এই শক্তিতে আতঙ্কিত আমেরিকার নেতৃত্বে NATO-র মত সামরিক জোট আত্মপ্রকাশ করে। অপর পক্ষে, সোভিয়েত রাশিয়াও পাল্টা জোট তৈরি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালে নতুন পর্যায়ে জোট রাজনীতির সূচনা হয়েছিল।

সামরিক জোট গঠন রাজনীতির সূচনা

(১) ন্যাটো, ১৯৪৯ খ্রিঃ (NATO) : সোভিয়েত রাশিয়ায় উত্তরোত্তর ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি এবং তার বেপরোয়া মনোভাব আমেরিকাকে উদ্বিগ্ন করে। ঠাণ্ডা লড়াই চললেও যে কোন সময় তা সশস্ত্র সংঘাতে পরিণত হতে পারত। 'ব্রাসেলস চুক্তিভুক্ত' দেশগুলির পক্ষে সোভিয়েত আগ্রাসন রুখে দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে মার্কিন দেশ, ঠাণ্ডা লড়াই ও তজ্জনিত বড় যুদ্ধের আশঙ্কায় নিজস্ব অস্ত্রসজ্জা করছিল এবং আণবিক অস্ত্রভাণ্ডারও মজুত করছিল। এখন ব্রাসেলস চুক্তির ভিতর মার্কিন